২০০৬

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ২১তম সংখ্যা

১৫ মে, ২০০১ ইসাব্দ

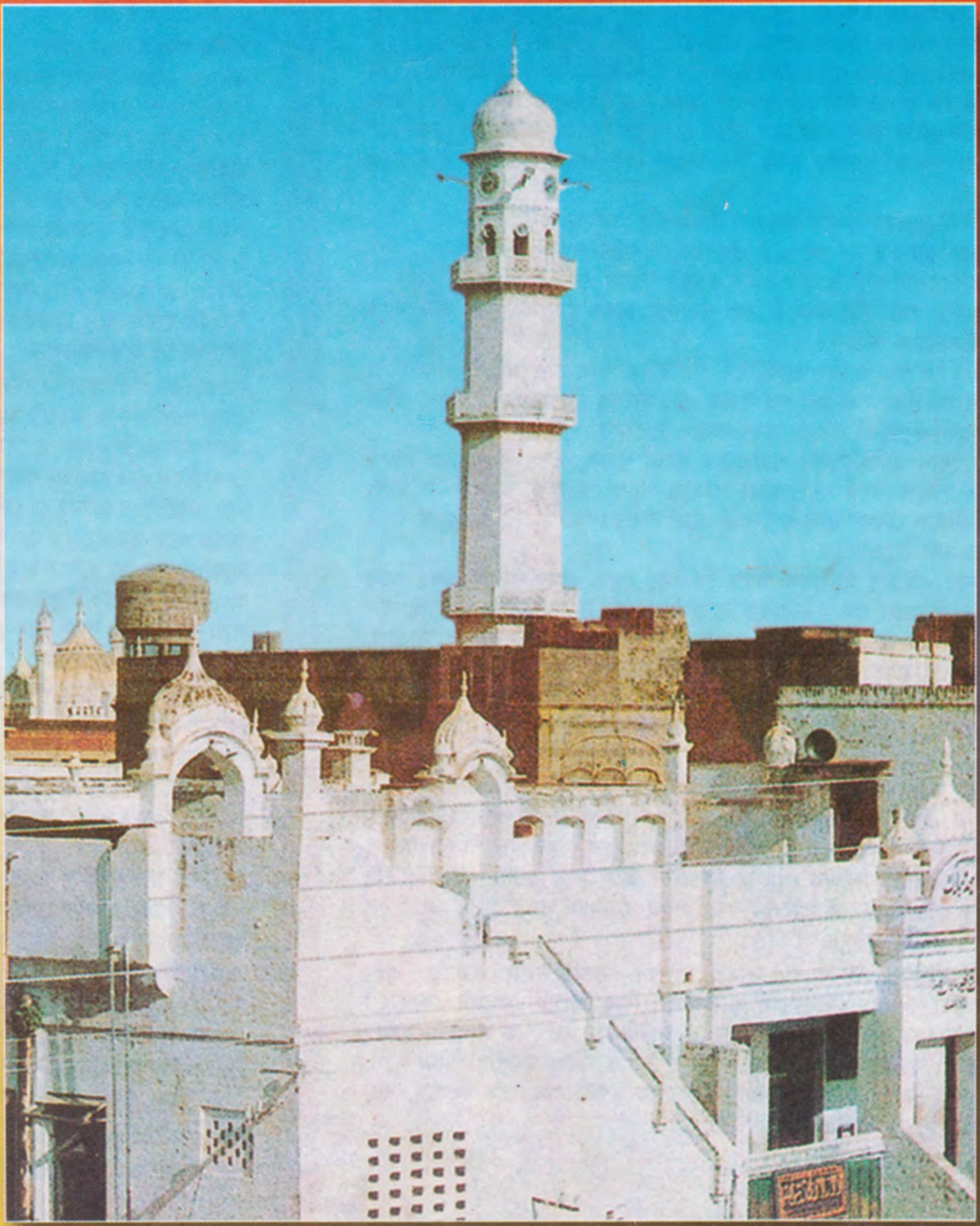

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

খেলাফত দিবসের শিক্ষা

পবিত্র কুরআনের সূরাতুন্ নূরের আয়াতে ইস্তিখলাফে ঐশী প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী- 'সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত'-অর্থাৎ অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) মোতাবেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭মে ইসলামে পুনরায় প্রতিশ্রুত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা মহা সৌভাগ্যবান যে, এ খেলাফতে অন্তর্ভুক্তির সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে ইসলামী খেলাফতের এ দ্বিতীয় বিকাশকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার আশ্বাস-বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এ খেলাফতকে দীর্ঘস্থায়ী করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে খেলাফতের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা যদি আমরা সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে আমাদের দ্বারা খেলাফত দীর্ঘস্থায়ী হবে না আর আমারাও এতদ্দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হতে পারবো না।

খেলাফতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মাঝে সবচে' বড় যে বিষয়টি তাহ'ল খেলাফতের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। আর শুধু খেলাফতের প্রতি আনুগত্য থাকলেই চলবে না বরং খেলাফতের অধীনস্থ যে চেইন অব কমান্ড আছে তার প্রত্যেক ধাপের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য থাকতে হবে। আজকে আহমদী জামাত একটি ক্ষুদ্র জামাত হয়েও যে সারা বিশ্বে অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে, তার মূল শক্তি যোগাচ্ছে খেলাফত ও এর প্রতি আহমদীগণের ঐকান্তিক আনুগত্য।

প্রত্যেক বছর ২৭শে মে তারিখে আমরা খেলাফত দিবস পালন করে থাকি। আমাদের এ দিবসটি পালন সার্থক হবে যদি আমরা সকলে খেলাফত তথা গোটা খেলাফতের যে ব্যবস্থাপনা এর প্রতি আনুগত্যের বিষয়টাকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে। আল্লাহ্তাআলা সর্বদা আমাদেরকে এ খেলাফতের প্রতি দায়িত্বপালন ও এথেকে কল্যাণ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

বাংলাদেশের সকল জামাতকে ২৭শে মে দিবসের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সমুন্নত করার লক্ষ্যে সভা-সম্মেলন করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ২১তম সংখ্যা

২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ২০ সফর ১৪২২ হিঃ কাঃ
১৫ হিজরত ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ মে ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

সম্পাদকীয়

খেলাফত ইসলামের আত্মা-বিশেষ

ধর্ম জগতে খেলাফতের ব্যবস্থা অপরিহার্য। হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা এ বিশ্বে প্রথম খেলাফত ব্যবস্থাকে স্থাপন করেছিলেন। এর পর থেকে প্রত্যেক নবীর যুগেই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও পূর্ণতা দেয়ার জন্যে খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও বহমান ছিলো। প্রত্যেক ধর্মীয় ইতিহাস পাঠক তা অবহিত আছেন। খেলাফত-ব্যবস্থা ইসলামেরও অবিচ্ছেদ্য অংগ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে নবুওয়তের পরে চিমনীস্বরূপ খেলাফত-ব্যবস্থা হলো ইসলামের দেহে আত্মা-বিশেষ। তাই সূরাতুন্ নূরের সপ্তম রুকূতে আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সবল, সুঠাম, সুনিয়ন্ত্রিত, সক্রিয়, গতিশীল এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি, শংকা, দুর্বলতা, শিরক তথা পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ ও ছত্রছায়ায় খেলাফত-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন-এমন কি হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও কিয়ামতকাল ব্যাপী খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বহমানকল্পে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে একটি ঐতিহাসিক অবশ্য-ঘটনীয় পর্যায়ক্রমিক চিত্রের বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি (সঃ) বলেছেন- আমার নবুওয়ত যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি তা তুলে নিবেন। তারপর নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তা তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর আত্মঘাতি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তা তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর জোর-জবরদস্তিমূলক বিচ্ছিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মধ্যে তা ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা-ও তুলে নিবেন। তারপর তিনি পুনরায় নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এ পর্যন্ত বলে হুযূর (সঃ) নীরব থাকলেন (মিশকাতুল মাসাবিহ্; বাবুল ইনযার ওয়াত্ তানযীর, পৃষ্ঠা-৪৬১)।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা নবী করীম (সঃ) বর্ণিত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত চিত্রটির হুবহু রূপায়ণ দেখতে পাই। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়তের পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উপরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা ৩০ বছর অব্দি প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে খেলাফত-ব্যবস্থার চিরশত্রু ইবলীসি শক্তির চক্রান্তে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মাধ্যমে তখনকার মত প্রকৃত খেলাফত-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দামেস্কে উমাইয়া, বাগদাদে আব্বাসী, মিশরে ফাতেমী ও পরে তুরস্কে উসমানীয়া প্রভৃতি রাজতন্ত্র / স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; যদিও এ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রগুলোকে খেলাফতের বস্ত্রাবরণে চালানো হয়, কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এগুলোকে যথার্থই 'মূলকান আয্যান' ও 'মূলকান জাবারিয়্যান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এ নামসর্বস্ব খেলাফতের ইতি টানা হয় তুরস্ক-পিতা মোস্তফা কামাল পাশার মাধ্যমে। এ সময়েই খেলাফত-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ খেলাফত আন্দোলন চালানো হয়েছিলো জোরে-শোরে। অথচ ইহা সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খেলাফত তিনিই প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়। তাই যথাসময়েই আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফত আলা মিন হাজ্বিন নবুওয়ত অর্থাৎ নবুওয়তের তরীকা ও পন্থায় পুনরায় ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাঠামোগত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত হাজীউল হারামাঈন শরীফাঈন হাফেয মাওলানা হাকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমে। এ খেলাফত-ব্যবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর মাহ্‌দীর মাধ্যমে (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। তবে তা অবশ্যই মু'মিন সমাজের ঈমান ও আমলে সালেহার সাথে শর্তযুক্ত। আজ সারা বিশ্বে ইসলামে আহমদীয়া খেলাফতের নেতৃত্বে তৌহীদের ঝান্ডা নিয়ে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বীর সেনানীরা ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সংঘটিত হবে। তখন সারা বিশ্বে ধর্ম বলতে বুঝাবে ইসলাম আর নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় নবী মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুন্ নূর-২৪	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ আনুগত্য	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
❑ অমৃত বাণী ঃ ইসলামী যুদ্ধ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ)-এর যিকরে খায়ের হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১২
❑ হোমিও প্যাথিক – সদৃশ্য বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৩-১৪
❑ আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা সংকলন - মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্, ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৫-১৭
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্‌তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
❑ এম. টি.এ ডাইজেষ্ট	ঃ সংকলন- জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	১৯-২০
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১-২৩
❑ আমার জীবন ঃ মূল - শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন	ঃ অনুবাদ - মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন	২৪-২৫
❑ নতুনদের পাতা ঃ তাহ্‌রীকে ওয়াকফে নও ও আমাদের কর্তব্য	ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম	২৬-২৯
স্মৃতি থেকে	ঃ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর	৩০-৩২

প্রচ্ছদ ঃ ভারতের পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ানে মসজিদে মোবারক ও মিনারাতুল মসীহ্

কালামুল ইমাম
খেলাফতে আহমদীয়া কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধান ইহাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দেখান; সুতরাং এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদাতাআলা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। কেননা, ইহা স্থায়ী, যাহার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলিয়া যাইব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন যাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নহে বরং উহা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতাআলা বলিতেছেন ঃ

'আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব'। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদদিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন ইহার পর সেই দিবস আগমন করে যাহা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রহিয়াছে যাহা এখন অবতীর্ণ হইবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকিবে, যাহার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়াছেন। আমি খোদার তরফ হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা দ্বিতীয় বিকাশ হইবেন, অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামাতের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হইতে অবতীণ হয় এবং তোমাদিগকে ইহাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত পরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট জানিবে; তোমরা জান না যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে। জামাতের পবিত্রাত্মা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়াত (দীক্ষা) লইবেন। খোদাতাআলা চাহিতেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধ প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তাহারা ইউরোপেই বাস করুন বা এশিয়াতেই বাস করুন, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহার ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই খোদাতাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি" *(আল-ওসীয়্যত পুস্তক থেকে পৃষ্ঠা ১৫-১৭)।*

এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে

এডিশনাল ওয়াফিলুত তবশীর একটি সার্কুলারে জানিয়েছেন, অনবরত গরুর খুরাবোগ বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না দেয়ার প্রেক্ষিতে টিলফোর্ড এলাকায় যুক্তরাজ্যের এ বছরের সালানা জলসা করতে অপারগতা জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর সাহেব।

এতদ্‌অবস্থাদৃষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবেয় (আইঃ) দয়া পরবশ হয়ে জার্মানী জামাতের আমীর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। ফলে এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা **জার্মানীর মেনহেইমে ২৪-২৬ আগস্ট, ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে,** ইনশাল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে জার্মানী জামাত থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। এ আন্তর্জাতিক সালানা জলসায়– বর্তমান শতাব্দী তথা নতুন সহস্রাব্দীর প্রথম সালানা জলসায় যারা যোগদান করতে চান তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন এবং জলসার সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়া করতে থাকুন।

- আহমদী বার্তা

সূরাতুন্ নূর-২৪
(খেলাফত প্রসঙ্গে)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও এ রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে এ রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যা তাকে অর্পণ করা হয়েছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যা তোমাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে। যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তা হলে তোমরা হেদায়াত পাবে। আর এ রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছে দেয়া।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্যে তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যাকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, ও তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তিনি তাদের জন্যে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারা হবে দুষ্কৃতকারী। ২০৫৭

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর কৃপা করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করো না যে, যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করতে পারবে, তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়-বস্তুর ভূমিকারূপ এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর বার বার জোর দেয়া হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ-নির্দেশক, সে কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর উপর আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যামানায় আঁ হযরত (সঃ)-এর এ সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হচ্ছে কেবল আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে যা আঁ হযরত (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *(দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃষ্ঠা- ১৮৬৯-১৮৭০)।*

খেলাফতকে মজবুতির সাথে ধর

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজ বপন করে যার পর খেলাফত উহার 'তাসীর' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা খেলাফতে হাক্কাকে মজবুতির সাথে ধর এবং উহার আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাতে খোদাতাআলা তোমাদের উপর দয়া ও কৃপা বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জগতেও উন্নত করেন, এবং সেই জগতেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের অঙ্গীকার পূরণ করে যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাতে থাক। আমদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের প্রকৃত সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং দুনিয়াতেও খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন" সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ), আল্ ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য

কুরআন ঃ

" হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করো তাহলে তোমরা উহা আল্লাহ্ ও এ রসূলের প্রতি সমর্পণ করো যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের ওপরে ঈমান রাখো। ইহা বড়ই কল্যাণজনক ও পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম" (সূরাতুন্ নিসা ঃ ৬০ আয়াত)

হাদীস ঃ "আনিব্‌নি উমারা ক্বলা সামি'তু রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলু আলাল মারএল মুসলিমিস সামআ ওয়াততআতা ফীমা আহাব্বা ওয়া লাও কারিহা ইল্লা আইঁ ইউশারা বিমা'সিয়াতিন ফাইন উমিরা বিমা'সিআতিন ফালা সামআ ওয়া লা তাআতা"।

অর্থ ঃ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার কর্মকর্তার আদেশ পালন করা আবশ্যকীয় যদিও বা তার (কর্মকর্তার) আদেশ ভালো লাগুক বা না লাগুক, তবে হাঁ, যদি গুনাহ্ বা নাফরমানীর (খোদা ও রসূল সঃ-এর হুকুম বিরোধী) আদেশ থাকে তবে তা পালন করা আবশ্যকীয় নয় (বুখারী)।

ব্যাখা ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের এক সুসভ্য ও সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে পরিণত হবার মূলমন্ত্র বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে, হে মুসলমানগণ আনুগত্য করো, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত।

উপরোক্ত হাদীস ইসলামী আনুগত্যের এক স্বর্ণালী শিক্ষার নীতি বর্ণনা করছে। ইসলাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ধর্ম। ইসলাম কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণের শিক্ষা দেয় না। তবে যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাকে আনুগত্য ও সুশৃঙ্খল হবার আদেশ দেয় ও তাকে বলে, তোমার জীবন এখন এক বিধি-বিধানের মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে এবং ইহাই ইসলামের ঐকান্তিক দাবী। ইসলামের শিক্ষা হলো শুনো ও মানো। এ শিক্ষা দেয় না যে, যা ভালো লাগে তা মানো আর যা ভালো লাগে না তা মান্য করো না। হ্যাঁ, যদি কোন কর্মকর্তা শরীয়ত বিরোধী আদেশ দেয় তবে তা মান্য করা আবশ্যক নয়। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। যখন আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন নিজের ইচ্ছা অথবা কোন শর্ত থাকে না। তাই, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশকারীকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের উপর কর্মকর্তার নির্দেশ শুনা ও মান্য করা আবশ্যকীয়। এর মধ্যেই তোমরা শান্তি খুঁজে পাবে ও উন্নতি লাভ করবে।

ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় হলো সমস্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে মান্য করা হোক। আজ ইসলামী বিশ্বে যে হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা তার মূল কারণ হলো যোগ্য নেতার অভাব ও যারা তথাকথিত নেতা হিসেবে আছেন তাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে খোদা ও রসূলের নাফরমানী। বিশ্বে আজ কেবল একটি জামাত আছে যার নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এর সদস্যগণ এক নেতার অধীনে উঠে বসে। পৃথিবীর প্রায় ১৭০ টি দেশের আহমদীদের কান থাকে খেলাফতের দিকে। তাঁর কাছ হতে যে আদেশ আসে তা পালন করতে তারা ব্রতী হয়ে আছে। খেলাফতে আহমদীয়ার কেয়ামতকাল অবধি টিকে থাকা নির্ভর করে আমাদের ঐকান্তিক আনুগত্যের উপর। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ইসলামী যুদ্ধ

প্রয়োজনে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌তাআলা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। পরবর্তীতে ঐ ব্যবস্থা আপত্তির সম্মুখীন হ'লে তিনি যে কাজ করেন না, আমাদের রসূলে আকরম (সঃ) প্রথমে কোন তরবারী হাতে নেন নি। কিন্তু তাঁকে (সঃ) কঠোর থেকে কঠোরতর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তের বৎসর সময় একটি শিশুকে সাবালকে পরিণত করতে যথেষ্ট। এবং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মেয়াদ যদি এই (তের বৎসর) মেয়াদ থেকে দশ (বছর) কমিয়ে দেয়া হয়, তবুও তা যথেষ্ট হবে। মোটকথা এই দীর্ঘকাল ব্যাপী এমন কোন প্রকার কষ্ট বাকী ছিল না যা তাঁকে (সঃ) ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে মাতৃভূমি ত্যাগ করার পরেও তাঁকে (সঃ) পেছনে ধাওয়া করা হলো। অন্যত্র আশ্রয় নিলে সেখানেও শত্রু নিস্তার দেয় নি। অবস্থার এই পর্যায়ে যালিমদের অত্যাচার থেকে মযলুমদেরকে রক্ষা-কল্পে এই আদেশ হলো ঃ "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাহাদিগকে নিজেদের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' (২২:৩০,৮১)।

অর্থাৎ ঃ যাদের সাথে বিনা কারণে যুদ্ধ করা হয়েছে এবং অন্যায়মত তাদেরকে ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে- "আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক" সুতরাং এরূপ অবস্থায় তরবারী ধারণের প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া হযরত (সঃ) কখনো তরবারী হাতে নেন নি। হ্যাঁ, আমাদের যুগে আমাদের বিরুদ্ধে কলম ওঠানো হয়েছে, কলম দ্বারা আমাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে এবং কঠোর যাতনা দেয়া হয়েছে। এজন্য এর মোকাবেলায় 'কলম'ই আমাদের যুদ্ধাস্ত্র।

(অবশিষ্টাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাজীউল হারামাঈন হযরত হাফেয মাওলানা নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর যিক্‌রে খায়ের

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৬ মার্চ, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআউয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর সূরাতুল আহ্যাবের ২৪তম আয়াত পাঠ করে খুতবা প্রদান করেন।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ অবশ্য মু'মিনদের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যারা সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছে যা তারা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলো। আর তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা (শাহাদত বরণ করে) নিজেদের সংকল্প পূরণ করেছে এবং তাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা অপেক্ষা করছে আর তারা (নিজেদের সংকল্পে) তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নি"

গত শুক্রবার খুতবায় আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর স্মরণে কিছু বলেছিলাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সবচে' বেশী প্রশংসা করেছেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর। হুযূর (আঃ) তাঁর প্রশংসায় সবচে' বড় কথা যা বলেছেন তা এই, "আমি তাঁর কুরবানী দেখে বড় আর্শ্চয হয়েছি এবং আমার মন ভারাক্রান্ত হয়েছে যে, হায়! আমি যদি এতটা কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করতাম।"এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে। এরচে' বড় কথা আর হ'তে পারে না।

এবার আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর দোয়া কবুলের কতিপয় ঘটনা নমুনাস্বরূপ আপনাদের শোনাচ্ছি ঃ

তিনি (রাঃ) লিখেছেন," আমি কোন [illegible] শুনেছিলাম যে, কোন ব্যক্তি মক্কায় প্র[illegible] করে সর্ব প্রথম তার দৃষ্টি যখন কা'বা শরীফের উপর পড়ে তখন সে যে দোয়াই করবে তা অবশ্যই কবুল হবে। ঐ সময় আমার বর্ণনা সম্পর্কে এর দুর্বল -সবল যাচাই করার এতটা পড়াশোনা ছিল না যে, আমার দৃষ্টি যখন কা'বা শরীফের উপর পড়েছিল কখন আমি দোয়া করেছিলাম, 'হে আমার খোদা! আমি প্রতি মুহূর্তে তোমার সাহায্যের ভিখারী। আমি কোন্ কোন্ দোয়া চাইব। সুতরাং আমি দোয়া করছি, আমি যখনই কোন প্রয়োজনে তোমার কাছে কোন প্রকার দোয়া করব তখন যেন তুমি তা কবুল কর।

বর্ণনা যেমনই ছিল, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আমার ঐ দোয়া কবুল হয়েছে। বড় বড় নাস্তিক, বড় বড় প্রকৃতিবাদীর সাথে যখনই ধর্মীয় বিতর্কের সুযোগ হয়েছে,সকল ক্ষেত্রে ঐ দোয়ার বরকতে আমি সাফল্য লাভ করেছি এবং ঈমানে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে এসেছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) যে কথা বলেছেন বড় বড় ধর্মীয় বিতর্কে বিজয় লাভ হয়েছে দোয়ার কল্যাণে, এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের একটি চলমান অভিজ্ঞতা। আহমদীয়া জামাতের নিষ্ঠাবান লোকদের জীবনে এমন অগণিত ঘটনা রয়েছে। ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে অনেক

সময় মনে হচ্ছে যে, এই বুঝি হেরে গেলাম, কিন্তু দেখা গেল শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এমন যুক্তি শিখিয়ে দিয়েছেন যে, বিরোধীরা হতভম্ব হয়ে গেছে। **'ফাবুহিতাল্লাযী কাফারা'** (সূরাতুল বাকারাঃ ২৫৯) এর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে"।

তিনি আরও লিখেছেন "যখন ধরমপাল, "তারকে ইসলাম" (ইসলাম ত্যাগ) নামক পুস্তক লিখেছিল তার অনেক পূর্বেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে কুরআনের কোন আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে অথচ ঐ আয়াত তোমার জানা না থাকে এবং যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছে সে কুরআনে অবিশ্বাসী হলে আমার ঐ আয়াত সর্ম্পকে তোমাকে জ্ঞান দান করব।' যখন ধরম পালের বই ছেপে বের হ'ল, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ঐ বইয়ের উত্তর লিখবার শক্তি দিলেন। আমি যখন বই লিখতেছিলাম একদিন মাগরিবের নামাযে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, হে আমার প্রিয় প্রভু! এ ব্যক্তি কুরআনে বিশ্বাসী নয়। যদিও সে আমার সম্মুখে নেই, সে 'হুরূফে মুকাত্তয়াত' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। ঐ সময় দুই সিজদার মধ্যবর্তী স্বল্প সময়ে আমাকে বিপুল জ্ঞান দান করা হয়েছিল।

আল্লাহ্‌তাআলা যখন কাউকে বড় জ্ঞান দান করেন তখন ঐ জ্ঞানের প্রকাশার্থে যত সময় লাগে তত সময় বসে বসে শিখতে হয় না বরং এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উপলব্ধি ঘটে যায়।

অতএব, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) দুই সিজদার মধ্যবর্তী ঐ স্বল্প সময়ে বিরাট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর (রাঃ) নিজের লিখিত 'নূরুদ্দীন' নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'ঐ তফসীরে লিখার পর আমি নিজেই আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, এত বড় মাহাত্মপূর্ণ জ্ঞান-গর্ভ তফসীর এত শীঘ্রই কী-ভাবে আমি বুঝেছিলাম।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর দোয়া কবুলিয়তের একটি নমুনা ঃ

একবার তিনি (রাঃ) বললেন, 'আজ আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আমি মনে করলাম, আমি আর এ পৃথিবীতে থাকব না। এমতাবস্থায় আমি দু' রাকাআত নামায আদায় করলাম। প্রথম রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা ও সূরাতুয্ যোহা এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরাতুল ইনশিরাহ্ পড়ে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! আমাদের বিরুদ্ধে চর্তুদিক থেকে বিদ্রোহ হয়েছে। হে আল্লাহ্! ইসলামের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ হচ্ছে। মুসলমানরা মূলতঃ অলস হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়াও মুসলমানরা ইসলাম, কুরআন্ শরীফ এবং আঁ হযরত (সঃ)-সম্পর্কে বড় অজ্ঞও রয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! তুমি এদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সৃষ্টি কর, যার মধ্যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি থাকবে। সে দুর্বল ও অলস হবে না। বড় সাহসী ও প্রচন্ড মনোবলসম্পন্ন হবে। এত কিছুর পরও সে অটল ধৈর্যের অধিকারী

হবে। দোয়া করতে অভ্যস্ত হবে। অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করতে পারে। কুরআন হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী হবে। এমন ব্যক্তিকে একটি জামাত গঠন করে দাও, এমন জামাত যা কপটতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। এ জামাতের সদস্যদের মধ্যে অপরিমিত ধৈর্য ও সাহস থাকবে। তারা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী হবে এবং এতদুভয়ের উপর আমল করবে। দোয়ায় অভ্যস্ত হবে। ঈমানের পরীক্ষাতো আসতে থাকবে; কিন্তু হে আল্লাহ্! তুমি তাদের ঐ সমস্ত পরীক্ষায় সাফল্য দান করবে। এমন পরীক্ষা যেন না হয় যা তাদের সাধ্যের বাইরে।"

হুযূর (রাঃ)-এর এ দোয়া বড়ই অর্থবহ ও পরিপূর্ণ ধরনের একটি দোয়া। কিন্তু সবাইতো স্মরণ রাখতে পারবে না। অতএব, সারাংশ এই যে, কুরআন শরীফের অর্থ বুঝবার জন্য বড় বিনয়ের সাথে দোয়া করতে থাকবেন। নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে দোয়া করতে থাকবেন। কোন বিরোধী পক্ষের সাথে যদি তর্কযুদ্ধে নামতে হয় তখন যদি আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দোয়া করা হয় তবে আল্লাহ্তাআলা অসাধারণভাবে সাহায্য করবেন। এমন সাহায্য যে, বিবেক-বুদ্ধির আওতার বাইরে। আমি নিজেও দেখেছি।

খেলাফতের বহু পূর্বের কথা বলছি। প্রশ্ন-উত্তরের অনেক সভা হ'ত। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এমন মনে হোত যে, এর উত্তর বোধ হয় দিতে পারছি না। কিন্তু দেখতাম, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শেষ হবার সাথে সাথে এর উত্তর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এল্কা (প্রক্ষিপ্ত) হয়ে যেত। বাস্তবে, **"ফাবুহিতাল্লাযী কাফারা"**-এর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত (সূরাতুল বাকারাঃ ২৫৯)।

হযরত চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর দোয়া কবুলিয়তের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ ১৯০৯ইং সনে বর্ষাকালে একবার অনবরত ৮/৯ দিন যাবৎ বৃষ্টি হ'তে থাকল। কাদিয়ানের অনেক ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে পড়ল। হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব কাদিয়ানের বাইরে নতুন বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন তা-ও ভেঙ্গে পড়ছিল। বৃষ্টির অষ্টম বা নবম দিনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) বললেন, 'আমি দোয়া করছি। আপনারা আমার সাথে 'আমীন' বলবেন।' দোয়া শেষ করে হুযূর (রাঃ) বললেন, আজ আমি ঐ দোয়া করেছি, যে দোয়া আঁ হযরত (সঃ) জীবনে একবারই করেছিলেন। আপনারা আশ্চর্য হবেন, এমন কোন্ দোয়া যা হুযূর (সঃ) জীবনে একবার মাত্র করেছিলেন? বৃষ্টির জন্য দোয়া তো হুযূর (সঃ) জীবনে বহুবার করেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবার জন্য মাত্র একবার দোয়া করেছিলেন।

একবার ব্যতীত আর কোন দিন বৃষ্টি বন্ধ হবার জন্য দোয়া করেছিলেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

"হাওয়ালায়না ওয়ালা আলায়না" আমাদের এখানে যেন আর বৃষ্টি না হয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হলে হোক।" দোয়ার সময় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) যেই দোয়া শেষ করলেন, সাথে সাথে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আসরের নামাযের সময় আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল এবং রোদ উঠেছিলো।

সর্দার আব্দুল হামিদ সাহেব, অডিটর, রেলওয়ে লাহোর, বর্ণনা করেছেন, 'আমি একাউন্টেন্ট জেনারেলের দফতরে পাটিয়াল রাজ্যে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলাম। লাহোরে আমার বদলী হবার প্রস্তাব শুনে আমি খুব অস্থির ও বিচলিত হয়েছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখেছিলাম। হুযূর উত্তরে লিখেছিলেন,

"অনেক বেশী ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করবেন না। আল্লাহ্র সুন্নত এটাই যে, মানুষ যখন কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করে বসে তখন আল্লাহ্ ঐ পথ বন্ধ করে দেন। আপনি কি দেখেন নি ব্যাবসায়ীদেরও অনেক সময় লোকসান হয়ে যায়। কৃষকের ক্ষেত জ্বলে যায়। অতএব, ব্যাবসায়-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করবেন না। মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র উপর ভরসাই কাজে আসে। আপনি একটুও অস্থির হবেন না। আল্লাহ্তাআলাই খালেক-মালেক ও রাযেক আছেন। তিনি কখনও আপনাকে বিনষ্ট করবেন না।"

সরদার আব্দুল হামিদ সাহেব লিখেছেন, হুযূর (রাঃ)-এর দোয়ার পরে ডিসেম্বর, ১৯১০ ইং মাসে পাটিয়ালা রাজ্যের মহারাজার অনুমোদনক্রমে লাহোর থেকে আমার বদলী পাটিয়ালা রাজ্যে হয়ে গেল। এই বদলী আমার জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল। আমি একজন স্বাধীন ক্ষমতাবান কর্মকর্তা হিসাবে ঐ রাজ্যে ৩৪ বৎসর কর্মরত থেকে ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৫ ইং সনে পেনশনে অবসরপ্রাপ্ত হই। ঐ দিনই জেমস্ কারী এন্ড কোং রেলওয়ে অডিটর অফিসে চাকুরী প্রাপ্ত হই। দেশ বিভাগের সময় ঐ কোম্পানীর মালিক যারা ইংরেজ ছিলেন ১৯৪৯ ইং সনে তারা লন্ডনে চলে গেলেন এবং কোম্পানী আমার নামে করে দিয়ে গেলেন। ১লা এপ্রিল, ১৯৪৯ ইং থেকে আমি উক্ত কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার হিসাবে কর্মরত আছি। আল্লাহ্ যত দিন চাইবেন আমি এভাবে কর্মরত থাকব। এ সমস্ত সম্পদ এবং এতবড় মর্যাদা এ সবতো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর দোয়ারই ফল।

হযরত মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব (রাঃ) যিনি সর্বদা সবুজ পাগড়ী পড়তেন, তিনি লিখেছেন, ১৯১০ ইং সনে পুনরায় কাদিয়ান অঞ্চলে প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল। আমিও এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। যত গয়ের আহমদী এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেল কেউ বাঁচতে পারে নি। যখনই কেউ প্লেগে আক্রান্ত হোত সাথে সাথে তার কবর খোঁড়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হোত। আমার মৃত্যুর খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। বার বার হযরত সাহেব (রাঃ)-কে অবগত করেছিলেন আমার অবস্থার কথা। একদিন আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মেহমান বলে মনে হচ্ছিল. মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠেছিল। আমার পিতা যুহর নামাযের সময় মসজিদে আকসায় উপস্থিত হলে হুযূর (রাঃ) আমার কথা জানতে চাইলেন। আব্বা বললেন, শেষ সময় উপস্থিত মনে হচ্ছে। তার চোখ থেকে পানি ঝরতে শুরু করেছিল। তখন হুযূর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, মিঞা সাহেবের ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত। সুতরাং সবাই তার ছেলের জন্য এমন দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ কবুলই করে নেন। নামাযে খুব প্রাণ বিগলিত চিত্তে দোয়া করা হয়েছিল। আমার আব্বা বললেন, আমার বিশ্বাস হয়েছিল, আমার ছেলে এবার অবশ্যই বেঁচে যাবে। নামাযের পরে হুযূর (রাঃ) আমার আব্বাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমার আব্বা যখন ফেরত বাড়ী আসছিলেন মোকার্রম বাবা হাসান মোহাম্মদ সাহেব, পিতা হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেব, মোবাল্লেগ জাভা-এর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, 'আপনার ছেলের জন্য আমরা দুখিঃত'। আমার আব্বা এ কথা বড়ই হতাশ হলেন। উভয়ে বাড়ী এলেন, খবর পেলেন যে,আমি অচেতন অবস্থায় আছি, কিন্তু নিঃশ্বাস চলছে-। আমার আব্বা আনন্দে আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদায় পড়লেন। অল্প সময় পরই আমার জ্ঞান ফিরল। আমি স্বপ্ন দেখে উঠেছিলাম। আমি আমার স্বপ্ন বর্ণনা করতে আরম্ভ করলাম।

সপ্নে দেখলাম, 'আমি মারা গিয়েছি। আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে ঈদ গাহ্'র কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমার চোখ বন্ধ কিন্তু আমি সবই দেখছি।"

মৃত্যুর সময় এ ধরনের স্বপ্ন দেখা নিয়ে বিজ্ঞানী-রা অনেক গবেষণা করেছেন। অনেক কথা তারা আবিষ্কার করেছেন। অনেক সময় একজনকে মৃত মনে করা হয়। অথচ সে সবই লক্ষ্য করতে থাকে। আমাদের ডাঃ আব্দুল হামিদ মরহুমের স্ত্রী বেগম মাজেদা'র সাথেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এ থেকে বিশ্বাস হয় যে, বাস্তবেও এমন হয় অনেক সময়। বেগম মাজেদাও ক্যান্সারের রোগীণী ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি মারা গেছেন, অসুস্থ ছিলেন। স্বপ্নে পুরো হাসপাতাল ও কামরাগুলো দেখেছিলেন যেখানে পরে তাকে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছি। ঐ হাসপাতাল বাস্তবে তার দেখা ছিল না। মাজেদার আত্মীয়রা গোপনে কান্নকাটি করেছিলেন। ঐ সময় আমার দোয়ার কবুলিয়তের ফলে মাজেদা জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এখন পুনরায় বর্ণিত ঘটনার বাকী অংশ বলছি ঃ

হযরত মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের স্বপ্ন বর্ণনা করছিলাম। তিনি বলছিলেন, 'আমাকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি সবই দেখছি। কিন্তু বলতে পারছি না। আমার খাঁটিয়া কবরের কাছে রেখে দেয়া হ'ল। আমি দেখলাম, আমাদের প্রতি শেখ ঝান্ডো খোঁজা যে আমাদের প্রতিবেশী ছিল মসজিদে আকসার পার্শ্বে তার ফলের দোকান ছিল। সে আমার কবর পরিষ্কার করছিল। আমি তাকে বললাম, আমি তো আর পৃথিবীতে ফেরত আসব না। তুমি আমার কবরের নীচের মাটি খুব পরিষ্কার করে দাও। সে বলল, হ্যাঁ, আমি খুব পরিষ্কার করেছি। এখন চিকন বালি ছড়িয়ে দিচ্ছি। যেন কঙ্কর জাতীয় কিছু তোমার পিঠে না লাগে। নীচে শুয়ে দেখছি যে, জায়গাটা ছোট নাতো। তার পর শেখ ঝান্ডো নিজে ঐ কবরে শুয়ে গেল। তারপর আমি একটি সুন্দর মসজিদ দেখলাম এবং শেখ সাহেবকে বললাম, আমার কবরকে খুব পরিষ্কার করে দাও। আমি যেতে যেতে শেষ বারের মত নামায পড়ে আসছি। আমি উঠে মসজিদে চলে গেলাম, এবং নামায আরম্ভ করলাম। এমন সময় জ্ঞান ফিরলো। শেখ সাহেব কবরেই থেকে গেলেন। আমি জেগেই শুনলাম শেখ সাহেবের বাড়ী থেকে কান্না কাটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি বলতে থাকলাম, শেখ ঝান্ডু মারা গেছেন।

আমার খারাপ অবস্থা দেখে আমাকে কেউ বলেনি যে, শেখ ঝান্ডু মারা গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেখ, সত্যিই কি শেখ ঝান্ডু কবরে চলে গেছেন। আমি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জীবন লাভ করলাম। আমার ডান চোখে কেবল ঐ রোগের সামান্য প্রভাব রয়ে গেছে। বাকী সমস্ত শরীর ঠিক ছিল। আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খেতে পারতাম না। সবাই জোরপূর্বক আমাকে খাওয়াতে চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে বললাম, আমার জন্য মাস কলাই এর ডালের খিচুড়ী পাকাও। এর থেকে অর্ধেক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল খাবেন। নতুবা আমি খাব না। আমার মা হযরত সাহেবের (রাঃ) নিকট গিয়ে সব জানালেন। হুযূর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এমন খিচুড়ী পাকাও। এমনই করা হোল। হযরত সাহেব (রাঃ) সামান্য কিছু খেলেন বাকী অংশ চামচসহ আমার জন্য পাঠালেন। এক সপ্তাহ পর্যন্ত হুযূর (রাঃ)-এমনই করতে থাকলেন।

হে আল্লাহ! তুমি হুযূর (রাঃ)-কে জান্নাতে খাস স্থান প্রদান কর। তাঁর সন্তানদের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন কর।

হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব বাটালভী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

একদিন হুযূর (রাঃ) বর্ণনা করলেন, এক হিন্দুস্তানী সেনা অফিসার আমার নিকট এসে বললেন, হুযূর দোয়া করুন, "আমি যুদ্ধেও যেন না যাই অথচ মেডেলও প্রাপ্ত হই।" (ঐ সেনা অফিসারের নাম উল্লেখ হয় নি)। আমি বললাম, আমি তো জানি না আপনাদের ব্যাপারে কীভাবে মেডেল পাওয়া যায়। ঐ সেনা কর্মকর্তা বললেন, মেডেল সে পায় যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আমি বললাম, তবে আপনি যুদ্ধে না গিয়ে কীভাবে মেডেল পেতে পারেন। সে বলল, হুযূর দোয়া করুন, আমি বললাম; আচ্ছা আমরা দোয়া করব।'

কিছুকাল পরে ঐ সেনা কর্মকর্তা এসে বললেন, হুযূর আমি মেডেল পেয়ে গেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে পেলেন? সে বলল- "আমি বেস্ ক্যাম্পে ছিলাম, আমার নামে আদেশ এসে গেল 'যুদ্ধে চলে যাও।' আমি ভীত হ'লাম। কিন্তু যাত্রা করলাম, অল্প দূর গিয়ে ঐ সীমানা পেরিয়ে যুদ্ধের ময়দানের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। যে সীমানা পার হলেই তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে গণ্য করা হয় এবং একটি মেডেল তার প্রাপ্য হয়ে যায়। তারপরই আদেশ আসল ফেরত চলে যাও। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে হুযূর (রাঃ)-এর দোয়ার বরকতে যুদ্ধে না গিয়েও মেডেল পেয়ে গেলাম।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমার এক বন্ধু ছিলেন-যার বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি ছিল। আমার সাথে খুবই ভালবাসার আচরণ করতেন। আমি বার বার তাকে বিয়ে করার জন্য বলতাম। তার উপর আমার বড় প্রভাবও ছিল। অবশেষে তিনি বিয়ে করলেন। আল্লাহ্তাআলার অপূর্ব মহিমা এই যে, তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং এক কন্যা সন্তানের জন্ম হ'ল। তার পরের বছর আর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল।

আমার আয় রোজগার ঐ সময় খুবই কম ছিল। বড় কষ্টে আমাদের জীবন নির্বাহ হোত। যখন তার পুত্র সন্তানের জন্ম হ'ল তখন তিনি মোবারকবাদের পয়গাম দিয়ে আমার কাছে লোক পাঠালেন। আমার আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল তবুও মোবারকবাদের জবাবে আমাকে কিছু তো দিতেই হোল।"

আজকালও আমাদের সমাজে রীতি প্রচলিত আছে যে, মোবারকবাদের সাথে কিছু উপহার দিতে হয়। ঐ নবজাতকের জন্য কোন জামা-কাপড় বা কিছু উপহার দিতে হয়। একদিন আমি শাহপুর সেনানিবাসে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু টাকা পেলাম। আমি একথা মনে করে যে, আমার ঐ বন্ধু আমাকে কোন টাকা দেন নি আমি তার গ্রামে গেলাম। তিনি গ্রামের তার ছেলের সমবয়সী অনেক ছোট ছোট ছেলেদেরকে একত্রিত করে ডেকে আনলেন। সবাইকে বললেন, তাঁকে সালাম কর। আমি অনুভব করলাম- আমার পকেটে যে পরিমাণ টাকা আছে তার তুলনায় ছোট ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। অতএব, প্রত্যেককে পৃথক পৃথক টাকা না দিয়ে আমি আমার পকেটের সব টাকা তার ছেলের হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি যখন দেখলেন, আমি কেবল তার ছেলেকে টাকা দিলাম তিনি এটা তার ছেলের জন্য শুভ লক্ষণ হিসাবে মনে করলেন। তিনি ধরে নিলেন, তার ছেলে বিত্তশালী হবে আর বাকী ছেলেরা তার ছেলের মুখাপেক্ষী হবে, এই মনে করে তিনি তার ছেলের হাত দিয়ে ঐ টাকাগুলো সব ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। আমি নিজ গৃহে ফেরত চলে এলাম।

আমার এক বন্ধু মোকাররম ফযলদীন আমাকে বললেন, এভাবে তো দিতে হয় না। আপনি ঐ ছেলের জন্য এক জোড়া কাপড় তৈরী করে পাঠাবেন। সুতরাং ঐ ছেলের জন্য এক জোড়া কাপড় বোম্বাই থেকে তৈয়ার করানো হ'ল। খুব মূল্যবান কাপড় ছিল এবং বয়স্ক যুবকের মাপে বানানো হয়েছিল। আমি ঐ কাপড় কোন ব্যক্তির হাতে ঐ বন্ধুর ছেলের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। তিনি ঐ কাপড় দেখে নিজের ছেলের শুভ লক্ষণ

মনে করলেন যে, তার ছেলে বয়স পাবে। ছেলে বড় হ'লে ঐ কাপড় পড়বে।

আমার পাঠানো ব্যক্তি যখন কাপড় দিয়ে ফেরত এল তখন আমি আমার বন্ধু ফযলদীনকে বললাম, 'আল্লাহ্‌তাআলা ধন-সম্পদ এর নাম ফযল রেখেছেন, যা কেবল তাঁর ফযল বা অনুগ্রহের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।' মসজিদের মধ্যে প্রবেশের সময় বলতে হয় - **ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়াবা রহমাতিকা**।' যখন মসজিদ থেকে বের হয় তখন বলতে হয় **"আবওয়াবা ফযলিকা**।" এখানে আঁ হযরত (সঃ) নিজেই তফসীর করে দিয়েছেন যে, 'ফযল' ধন-সম্পদকে বলা হয়। আমার লাভ হয়েছিল এই যে, আমি আগামীতে কখনও সৃষ্টির কারো কাছে কোন প্রকার আশা করব না।

আল্লাহ্‌তাআলা আগামীতে আমার জন্য নিজ অনুগ্রহে (ফযলে) রিযক-এর ব্যবস্থা করবেন। আমি আগামীতে কাউকে টাকার বিনিময়ে ঔষধ বা চিকিৎসা দেবার কথা চিন্তা করব না। এটি একটি ধন-সম্পদ লাভের ব্যবস্থাপত্র আমার হাতে এসে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন"।

এডিটর আল্ হাকাম, হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রাঃ) লিখেছেন,

একদিন মাগরিবের পরে আমি হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। সেখানে আরো কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (রাঃ) বললেন,

'মানুষের অসুখ-বিসুখের মাধ্যমে যে পরীক্ষা আসে তা বড় অদ্ভুত হয়। খরচ-পত্র বেড়ে যায়। আয় কম হয়ে যায়। অন্য মানুষের খোশামোদ করতে হয়। আমার উপার্জনের উপায় বাহ্যতঃ এই চিকিৎসা বিদ্যা ছিল যা আমার অসুখের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরা জানে না আমার অবস্থা। তারা মনে করত, আমার উপার্জনের পথ এই চিকিৎসা বিদ্যা এবার উপার্জনের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমার স্ত্রী বললেন, 'ঘরে কোন টাকা পয়সা নেই'। আরও বললেন, 'আপনি তো অসুখ-বিসুখের কথা স্মরণ করে কোন ব্যবস্থাও রাখেন নি। অসুখ-বিসুখের সময় কয়েকদিনের খরচ চালাবার মত টাকা তো রাখতে হোত'। আমি বললাম, 'আমার খোদা কখনও এমন করেন না। আমি তো আমার খোদার উপর ঈমান রাখি'। বর্ণনা তো অনেক বড়। হুযূর (রাঃ) সম্পর্কে পৃথক বইও আছে। তবে আমার বিশ্বাস হুযূর (রাঃ) সম্পর্কে যে সব ঘটনা বর্ণনা করেছি এতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বৃদ্ধি পাবে। ভরসার মোকাম বড় উঁচু। এর মধ্য দিয়েই তো প্রকৃতপক্ষে তৌহীদের পরিচয় পাওয়া যায় তাওয়াক্কুল যদি না থাকে তবে কিছুই বাকী থাকে না। কুরআন করীমের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর আত্মিক সম্পর্ক অনেক বেশী গভীর ছিল। হুযূর (রাঃ) বলেছেন,

'কুরআন শরীফের মত এত প্রিয় গ্রন্থ আর কখনও পাই নি। কোন গ্রন্থ এর চেয়ে বেশী পসন্দ হয় নি। অতএব, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। আমি দোয়া করেছি, আল্লাহ্ আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দাও যা একটি সম্পূর্ণ দোয়া হবে। তারপর আমার হৃদয়ে দোয়া অবতীর্ণ করা হ'ল যে, 'আমি অস্থির ও অধীর হয়ে যে দোয়াই করবো তা কবুল করা হবে।' এই দোয়ার ফলে আমার অন্তরে কুরআনের ভালবাসা প্রদান করা হয়েছে।"

অন্য এক সময় হুযূর (রাঃ) বলেছেন, "আমার নিকট এমন কোন চাকু নেই যদ্বারা তোমাদেরকে আমার হৃদয় চিরে দেখাতে পারতাম যে, কুরআনের সাথে কতবেশী ভালবাসা আছে আমার অন্তরে।"

হুযূর (রাঃ) সম্পর্কে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রাঃ) জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজার চিকিৎসক ছিলেন। সেখানে কর্মচারী ও সেবকদের কুরআন শোনাতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা সবাই হিন্দু ছিলেন। দু'দিন পরে ওকিরাম নামক এক হিন্দু যিনি কোষাগারের কর্মকর্তা ছিলেন, বললেন, "তাঁকে (নূরুদ্দীন) কুরআন শোনানো থেকে বিরত রাখ, নতুবা আমি মুসলমান হয়ে যাব।"

হুযূর (রাঃ) বলতেন, যদি আল্লাহ্‌তাআলা নূরুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কী কী জিনিস সবচে' বেশী প্রিয়"? আমি বলব, "আমাকে কুরআন মজীদ দেয়া হোক।"

এখানে কুরআন প্রদানের অর্থ কুরআনের মা'রেফত (তত্ত্ব-জ্ঞান) বুঝায়।

হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আকদস ইমাম মাহ্দী (আঃ) আমাকে বারবার বলেছেন, হয়ত পঞ্চাশবার বলেছেন, 'মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের তফসীর (কুরআন শরীফের তফসীর) ঐশী তফসীর। তাঁর থেকে কুরআন পড়বে। যদি তুমি ২/৩ পারাও তাঁর কাছ থেকে পড়তে বা শুনতে পার তবুও তোমার মধ্যে কুরআন শরীফ বুঝবার বা তফসীর করবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।'

(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ)-কে 'মৌলবী সাহেব' বলে সম্বোধন করতেন। ঐ যুগে 'মৌলভী সাহেব' বড় সম্মানজনক সম্বোধন ছিল।)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) ১লা এপ্রিল, ১৯১৩ইং তারিখে মসজিদে আকসার কুরআন শরীফের দরস (তফসীর বর্ণনা) দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দুর্বলতা দেখা দেয়। প্রথমে বসে পড়লেন, তারপর শুয়ে পড়লেন। হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। তাঁর চলার শক্তি থাকল না। খাটের (দড়ির খাট) উপর তুলে হুযূরকে তাঁর বাস ভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মসজিদে মোবারকের কাছাকাছি এলে হুযূর বললেন, আমার বাড়ীতে নিয়ে চল, মসজিদে নিয়ে চল।' হুযূর (রাঃ)-কে মসজিদে মোবারকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। হুযূর মসজিদে পৌঁছে মাগরিবের নামাযে শামেল হলেন, নামাযের পরে আবার এক রুকূর দরস্ দিলেন। তারপর খাটে করে গৃহে পৌঁছানো হ'ল। রাতে বিশ্রামের পর সকালে অনেকটা সুস্থবোধ করলেন। এবং ফজরের পরে দরস্ দিলেন এবং রোগীদেরও চিকিৎসা করলেন।

হুযূর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'তারিখে ইবনে খালদুন' কিতাব খানা পড়ার আগ্রহ ছিল আমার। একদিন এক ব্যবসায়ী ঐ কিতাব খানা বিক্রয়ের জন্য এনেছিল। ৭০ (সত্তর) টাকা দাম চাইলে বললাম, এক সাথে এত টাকা দিতে পারব না। যদি দিতে পার তবে কয়েক কিস্তিতে টাকা দিয়ে দিব। কিন্তু ঐ বিক্রেতা কিস্তিতে টাকা নিতে রাজি হয় নি। সে চলে গেল। আমি যুহরের নামাযের সময় আমার ডাক্তার খানায় এলাম তো ঐ বইখানা টেবিলে রাখা দেখলাম। কেউ বলতে পারল না যে, কে এই বইখানা রেখে গেছে।

আমি কখনও কখনও লোকদের কাছে বলতাম ঐ ঘটনার কথা। একদিন আমার এক রোগী বলল, ঐ কিতাব এক শিখ রেখে গেছে। যাকে আমি দেখে চিনতে পারি। কিন্তু নাম জানি না। সে এখানে তহ্‌সীল অফিসে প্রায়ই যাতায়াত করে। কিছুদিন পর একবার সে ঐ শিখকে ডেকে আনল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ কিতাব কীভাবে রেখে গেলেন? ঐ ব্যক্তি বললেন, আপনার মজলিসে কথা হয়েছিল যে, আপনার নিকট এ বই কিনবার টাকা ছিল না। আমি এই কিতাব খানা কিনে আপনার এখানে রেখে গেছি। আমি এই সত্তর টাকা অমুক ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে বুঝে নিয়েছি। কারণ ঐ ধনী ব্যক্তি আমাকে বলে রেখেছেন,

"যখনই নূরুদ্দীনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁকে পৌঁছে দিবে। আমাকে

জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করবে না।" আমি তার আদেশ অনুসারে আপনার জন্য ঐ বই কিনে রেখে গিয়েছিলাম। হুযূর (রাঃ) বললেন, আমার কাছে যেহেতু সত্তর টাকা জমা হয়ে গিয়েছিল, আমি ঐ টাকা আমার লোক মারফত ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠিয়েছিলাম। তিনি বড় রাগান্বিত হয়ে আমার টাকা গ্রহণ করেছিলেন, এত রাগছিল যে, আমার লোকটাকে চা পানিও সাধেন নি।

তারপর একদিন তিনি আমার ভাইকে ডেকে বলেছিলেন, আমি নূরুদ্দীন সম্পর্কে চিন্তা করে রেখেছি, তার জন্য নয্‌রানার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি নি। [নযরানা অর্থ ঃ আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের খেদমতে যে উপঢৌকন পেশ করা হয়- অনুবাদক]

তাই আমি বিবেচনা করে স্থির করেছিলাম, 'আমরা সবাই তাঁরই'। সুতরাং আমার কর্মচারীদের ও সেবকদের বলে রেখেছিলাম যে, যখনই প্রয়োজন হয় তাঁর জন্য নির্দ্বিধায় যত টাকা দরকার খরচ করবে কিন্তু তিনি তো আমার সত্তর টাকাও ফেরত পাঠিয়েছেন। আমি এতে খুবই কষ্ট পেয়েছি। এখন আমি কী করতে পারি।"

আমার ভাই ঐ ধনবান ব্যক্তির নিকট থেকে সত্তর টাকা নিয়ে এলেন এবং বললেন, 'আমি তাকে বুঝিয়ে বলব।' আমাকে আমার ভাই এসে বললেন যে, আমি ভাল করি নি। টাকা ফেরত পাঠানো ঠিক হয় নি।

অতএব, তিনি ঐ সত্তর টাকা নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার খাতিরে ঐ টাকা ফেরত গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।"

হুযূর (রাঃ)-এর ভাই ঐ টাকা রেখে দিলেন। ঐ ধনী ব্যক্তি মনে করলেন যে,তার উপহার নূরুদ্দীন (রাঃ) কবুল করেছেন এবং তিনি খুশীও হলেন।

একদিন এক ব্যক্তি একটি বড় অংকের টাকা যা তিনি হুযূর (রাঃ)-এর নিকট গচ্ছিত রেখে ছিলেন, ফেরত নিতে আসলেন। হুযূর (রাঃ) বললেন, আপনি যুহরের নামাযের পরে এসে টাকা নিয়ে যাবেন।' নামাযের পর হুযূর (রাঃ) নিজ 'সাদরী' মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেবকে দিলেন যে, এটা ঝুলিয়ে রাখ। (সাদরী অর্থ- ছোট হাফ কোর্ট)। মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব বর্ণনা করেছেন ঃ আমি খুব ভাল করে যাচাই করেছিলাম যে, সাদরীর পকেটে কোন টাকা ছিল না। আমি চিন্তা করছিলাম- হুযূর (রাঃ) কোথা থেকে এত টাকা ঐ ব্যক্তিকে দিবেন।

কিছুক্ষণ পর ঐ পাওনাদার এলেন, হুযূর আমাকে (রাঃ) ঐ সাদরী দিতে বললেন। আমি হুযূরকে সাদরী দিলাম। হুযূর সাদরীর পকেট থেকে টাকা বের করে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, গুণে নিন। ঐ ব্যক্তি টাকা গণনা করে বললেন, "পুরো টাকাই আছে।"

ঘটনা বর্ণনাকারী মৌলভী মোহাম্মদ দীন (রাঃ) বলেছেন, ঐ ঘটনা দেখার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, রিয্‌ক এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নিজস্ব ব্যাপার। আল্লাহ্‌ যাকে যেভাবে চান দিয়ে থাকেন। এরপর আমি আর কখনও জানবার চেষ্টা করি নি, তাঁর (রাঃ) টাকা কোথা থেকে আসে।'

আরও একটি চমৎকার ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওওয়াল (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, হুযূর যখন মহারাজা কাশ্মীরের চিকিৎসকের চাকুরী ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর উপর এক লক্ষ পঁচান্নব্বই হাজার টাকার ঋণ পরিশোধযোগ্য ছিল। চিন্তা করতে পারেন কত বড় ধরনের বোঝা ছিল আজ কালকের হিসাবে কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। হুযূর যেহেতু মানবতার সেবায় খরচ করতেন তাই তিনি নির্ভয়ে ঋণে টাকা নিয়েও খরচ করতেন। আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর এর ঋণের ভার আশ্চর্যজনকভাবে চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মহারাজা হুযূরকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীতে মহারাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হুযূর (রাঃ)-এর সাথে অন্যায় করা হয়েছিল। মহারাজা হুযূরকে পুনরায় চাকুরীতে সম্মানজনকভাবে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (রাঃ) ততদিনে কাদিয়ানে চলে এসেছিলেন। হুযূর জবাবে মহারাজাকে জানালেন, আমাকে যদি সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব দেয়া হয় তবুও আমি তার বিনিময়ে এ স্থান (কাদিয়ান) ত্যাগ করতে পারব না। মহারাজা গভীরভাবে অনুভব করছিলেন যে, হুযূর (রাঃ)-এর সাথে অবিচার করা হয়েছে। তাই অন্য কোনভাবেও হুযূরকে সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন। মহারাজা আদেশ করলেন, "এর পর থেকে জঙ্গলের কাঠের চুক্তি এমন ঠিকাদারকে দেয়া হবে যে তার লাভের অর্ধেক অংশ হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-কে দিতে বাধ্য থাকবে।" সুতরাং এই মর্মে টেন্ডার আহ্বান করা হ'ল।

এবার দেখুন, আল্লাহ্‌তাআলা কীভাবে হুযূর (রাঃ)-এর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন এবং কি আশ্চর্য নিদর্শন প্রদর্শন করেন!

যে ব্যক্তি জঙ্গলের ঠিকা চুক্তি পেল, সে ব্যক্তি বছর শেষে হিসাব করে দেখল যে, ঠিক তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা লাভ হয়েছে। যার অর্ধেক এক লক্ষ পঁচান্নব্বই হাজার টাকা হয়। এত টাকাই হুযূর (রাঃ)-এর ঋণ ছিল। যখন হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে এই টাকা পেশ করা হ'ল হুযূর বললেন, এই টাকা অমুক শেঠকে দিয়ে দেয়া হোক, আমার উপর ঐ শেঠ সাহেবের এত টাকা ঋণ ছিল ।

পরের বছরও উপরোক্ত শর্তে জঙ্গলের ঠিকা চুক্তি দেয়া হ'ল। বছর শেষে ঠিকাদার লাভের অর্ধেক হুযূর (রাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন। কিন্তু এবার ঐ টাকা হুযূর গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, এ কাজে আমার কোন মূলধন বিনিয়োগ করা ছিল না, আর আমি এর জন্য কোন পরিশ্রমও করি নি। অতএব এ টাকা গ্রহণ করতে পারি না। ঠিকাদার হুযূরকে বললেন, টাকা অবশ্যই গ্রহণ করুন। নতুবা আমি আগামীতে তো এ কাজের চুক্তি পাব না। হুযূর বললেন, যাই হোক এ টাকা নিতে পারি না। ঠিকাদার জিজ্ঞেস করলেন, গত বার কেন নিয়েছিলেন? হুযূর (রাঃ) বললেন, আমার পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অঙ্গীকার অনুসারে আমার ঋণ পরিশোধের জন্য টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঋণ শোধ হয়ে গেছে। অতএব, আর কেন? ঠিকাদার তখন ফেরত চলে গেল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আওওয়াল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ভেরায় এক খন্ড সরকারী জমি ছিল, যাকে 'কমিটার জমি' বলা হোত। আমি আমার এক মিস্ত্রি বন্ধুকে বললাম, তুমি এখানে দালান নির্মাণ কর। এক হিন্দুকে বললাম, তুমি টাকা দিয়ে দিবে। সুতরাং দালানের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। নির্মাণ কাজে যখন ১২০০/= (বারশত) টাকা ব্যয় হয়ে গেল, আমার চিন্তা হ'ল, ঐ হিন্দু যদি এখন টাকা চেয়ে বসে তখন টাকা তো দিতে হবে। অতএব, টাকার ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি এ চিন্তাই করছিলাম। আমার এক বন্ধু মালেক ফতেহ খাঁ ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এসে বললেন, "আমি রাওয়ালপিন্ডি যাচ্ছি। লর্ড লিসান রঈসদের দরবার ডেকেছেন। বড় বড় রঈসরা তো দিল্লী গিয়ে দরবারে অংশ নিবেন। ছোট রঈসরা রাওয়ালপিন্ডি দরবারে একত্রিত হবেন। আমাদেরকে রাওয়ালপিন্ডিতে ডাকা হয়েছে। আমি তার কানে কানে বললাম, আমাকেও তো দরবারে যেতে হবে। তিনি বললেন, এই তো ঘোড়া - চড়ে বসুন।

আমরা উভয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঝিলাম পর্যন্ত গেলাম। এখান থেকে রেল গাড়ীর সুযোগ ছিল। আমি বললাম, আমাকে তো দিল্লী যেতে হবে। মালেক ফতেহ খাঁ সাহেব রওয়ালপিন্ডি চলে

গেলেন। আমার কাপড়-চোপড় খুব ময়লা হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি ঝিলামের তহসীলদার মালেক হাকেম খাঁর পাজামা, পাগড়ী এবং কোট পড়ে নিলাম। আমার কাপড় খুলে দিলাম। এবার আমার কোটের নিচে জামা ছিল না। আমি হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। চলত চলতে ঝিলাম স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। আমি একজনের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে লাহোর পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের ভাড়া কত? সে বলল, পনের আনা। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম কেবল পনের আনাই আছে। আমি টিকেট নিয়ে লাহোর পৌঁছে গেলাম।

লাহোর স্টেশনে বড় ভীড় ছিল, কারণ দিল্লীতে দরবার আছে। আমার পকেটে কোন টাকা ছিল না। হঠাৎ এক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কোন এক রুগীর চিকিৎসার কারণে পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল। তার নাম গোলক নাথ। পাদ্রী সাহেব বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, দিল্লী যেতে হবে। গোলক নাথ বললেন, টিকেট পেতে আপনার খুব কষ্ট হবে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করছি। কিছু সময় পরে দিল্লীর টিকেট কিনে আনলেন। আমি তার থেকে টিকেট নিয়ে নিজ পকেটে হাত দিলাম। তাড়াতাড়ি পাদ্রী সাহেব বললেন, আমাকে অপমান করবেন না। আমি টিকেটের টাকা নিতে পারব না। আমিও তো দিল্লী যাচ্ছি। রাস্তায় দেখা যাবে। আমি পথের মধ্যে খোঁজ করে কোথাও তাকে পেলাম না। স্টেশনে নেমেও খোঁজ করলাম কোথাও পাদ্রী সাহেবকে পেলাম না। আমি দিল্লী স্টেশন থেকে বেরিয়ে চলতে থাকলাম। তখন আসর নামাযের সময়। সড়কের পাশে রঈসদের জন্য তাবু খাটানো ছিল। আমি বেশ কিছুটা গিয়ে ফেরত আসতে থাকলাম। সূর্য অস্তগামী ছিল।

আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ দেখি হযরত মুন্সী জামাল উদ্দিন (রহঃ)-এর চাকর এক সিপাহী দৌড়ে আসল আমার কাছে। আমাকে বলল, আপনাকে মুন্সী জামাল উদ্দিন সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে দেখেই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, এখনতো সময় নেই। কাল সকালে আসব, ইনশাআল্লাহ্।

সিপাহী বলল, মুন্সী সাহেব অবশ্যই আপনাকে যেতে বলেছেন। আমি বললাম, কাল সকালে দেখা করব। সিপাই বলল, নিকটেই মুন্সী সাহেবের তাবু। আপনি গিয়ে মুন্সী সাহেবকেই বলবেন, যা বলার। আমি অগত্যা গেলাম। হযরত মুন্সী জামাল উদ্দিন বড়ই আন্তরিকতা ও ভালবাসাপূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। বললেন, আমার দৌহীত্র মুহাম্মদ উমর অসুস্থ, তাকে অনুগ্রহ করে দেখুন। আমি বললাম, সকালে দেখব। মুন্সী সাহেব বললেন, আজ আমার এখানে থেকে যান, কাল সকালে বাড়ীতে গিয়ে আমার নাতীকে দেখবেন। আমার জন্য বড় আরামদায়ক পৃথক তাবু খাটিয়ে দেয়া হ'ল।

পরের দিন সকালে জুমুআ ছিল। হযরত মুন্সী সাহেব আমাকে তাঁর বাস ভবনে যেতে বলেছেন। অতএব, আমার জন্য রাতের মধ্যেই একজোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন। আমি সকালেই ঐ নুতন কাপড় পরলাম।

আমি বললাম, আমি তো অতি অল্প দিন আপনার কাছে থাকতে পারব। অথচ মিয়াঁ মুহাম্মদ উমরের যে টিউমার তা নিরাময় হতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। আমি বাড়িতে বলেও আসি নি। হযরত মুন্সী সাহেব বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে, অবশ্যই কিছুদিন থেকে যাবেন। পাঁচশত টাকার একটি নোট আমাকে দিলেন। আমি চিন্তিত হলাম যে, আমার তো বারশ' টাকার ঋণ শোধ করতে হবে। সম্ভবতঃ এটি ঐ স্থান নয় যেখানে আমাকে যেতে হবে। আমি তখন ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নোট ঐ হিন্দুর নামে পাঠিয়ে দিলাম এবং বাড়ীতে লিখলাম যে, চিন্তা করবেন না। কয়েকদিন পরে হযরত মুন্সী সাহেব আরও সাতশ' টাকা দিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, যেভাবেই হোক আরো কিছু দিন আমার সাথে থাকবেন এবং আমার সাথে ভূপাল যাবেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, ঋণ তো শোধ হয়েছে। অতএব চিন্তার কিছু নেই, যেখানেই যেতে বলেন, যেতে পারি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এতবেশী ভাল বাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন যার কোন তুলনা হয় না। কোন্ যুগে, সে যুগে এ যুগে কোন যুগে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় এমন বহু ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনও হুযূর (রাঃ)-এর হযরত আকদস (আঃ) সম্পর্কে 'হামারা মির্যা' (আমাদের মির্যা) শব্দ ব্যবহার করতেন। কখনো বড় বড় সম্মানজনক উপাধি ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল উভয়ের মধ্যে।

হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ যুগের সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এতবেশী ভালবাসতেন যার কোন নযির পাওয়া সম্ভব নয়। একদিন আমি হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেদমতে বসেছিলাম। কথা উঠল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোন এক ব্যক্তিকে তার মেয়ের বিয়ের জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিজ কন্যার বিয়ে হুযূর (আঃ)-এর প্রস্তাব মত দিতে রাজি হয় নি।

ঘটনাক্রমে হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খুব ছোট্ট কন্যা আমাতুল হাই ঐ সময়ে খেলতে খেলতে হুযূর (রাঃ)-র দৃষ্টির সামনে এসে গিয়েছিলেন। হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) ঐ ব্যক্তির রাজি না হওয়ার কথা শুনা মাত্র নিজ কন্যা আমাতুল হাইয়ের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমাকে যদি মির্যা সাহেব বলেন, তাহলে আমি তো আমার এই মেয়ের বিয়ে নিহালীর ছেলের সাথেও দিতে কোন দ্বিধা করব না।'

নিহালী এক মেথরানীর নাম। হুযূর (রাঃ)-এর এত গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল হযরত আকদস (আঃ)-এর সাথে যে নিজ কন্যাকে হুযূর (আঃ)-এর কথা মত মেথরানীর ছেলের সাথেও বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল না। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর আন্তরিকতাকে আল্লাহ্ কত মূল্য দিয়েছেন, দেখুন! তাঁর ঐ কন্যা আমাতুল হাই পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুত্র বধু হয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে হয়েছিল।

জনাব মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব আফগানী বর্ণনা করেছেন, একবার হুযূর (রাঃ) নিজ ডাক্তার খানায় বসেছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে অনেকে বসেছিলেন। একজন এসে হযরত মৌলভী সাহেবকে বললেন, হযরত (আঃ) আপনাকে স্মরণ করেছেন।

একথা শুনামাত্রই মৌলভী সাহেব এত দ্রুত ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন যে, পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে জুতা পরতে পরতে চলে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আদেশ পালনে যেন সামান্য দেরীও না হয়ে যায়।

হযরত মৌলভী সাহেব যখন 'খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল' হয়ে গেলেন তখন মাঝে মধ্যে বলতেন -"তোমরা কি জান যে, এখানে নূরুদ্দীনের একজন আপনজন ছিলেন যাঁকে মানুষ মির্যা বলে ডাকত। নূরুদ্দীন ঐ মির্যার পিছে পিছে প্রেমাসক্ত উন্মাদের মত হাঁটত। নিজের পাগড়ী বা জুতাও ঠিকমত পরার হুঁশ থাকত না।" মাষ্টার আল্লাদিত্তা, সিয়ালকোট বর্ণনা করেছেন,

১৯০০ইং / ১৯০১ইং সনের ঘটনা, তখন আমি কাদিয়ান দারুল আমানে অবস্থান করছিলাম। একজন নবাব সাহেব চিকিৎসার জন্য কাদিয়ানে হযরত মৌলভী সাহেবের নিকটে এসেছিলেন। তার জন্য পৃথক একটি বাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছিল। একদিন উক্ত নবাব সাহেবের কর্মচারীদের দু'জন একজন শিখ, অপরজন মুসলমান, হযরত মৌলভী সাহেবের খেদমতে এসে বললেন, নবাব সাহেবের নিজ এলাকায় লাট সাহেব (লর্ড সাহেব) আসবেন। নবাব সাহেব চাচ্ছেন যে, এ সময় আপনিও নবাব সাহেবের সাথে সেখানে চলুন। হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) বললেন, "আমি আমার প্রাণের মালিক নই। আমার একজন মালিক আছেন। তিনি যদি আমাকে যেতে বলেন, তবেই আমি যেতে পারি।"

তখন যুহরের নামাযের সময় হয়েছিল। নবাব সাহেবের কর্মচারীদ্বয় বসে থাকলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নামাযের জন্য আসলেন। তখন নবাব সাহেবের কর্মচারীরা তাদের আবেদন পেশ করলে হযরত (আঃ) বললেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা যদি মৌলভী সাহেবকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলি বা পানিতে লাফিয়ে পড়তে বলি, তিনি নির্দ্বিধায় তা করবেন। কিন্তু এখানে মৌলভী সাহেবের দ্বারা হাজারও মানুষের উপকার হয়। তিনি প্রত্যহ কুরআন ও হাদীস শরীফের দরস দেন, প্রত্যহ শত শত রোগী দেখে তাদের চিকিৎসা করেন। একটি জাগতিক কাজের জন্য আল্লাহ্র ফযলের এ প্রবাহকে বন্ধ করতে পারি না।"

মৌলভী সাহেব যখন হযরত আকদস (আঃ)-এর উপরোক্ত মন্তব্য শুনলেন, তখন খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আসর নামাযের পর মৌলভী সাহেব (রাঃ) দরস দিতে বসলেন। তখন খুশীর তাড়নায় কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি বললেন, - 'আজ আমি এত বেশী খুশী যে, কথা বলতে পারছি না। আমি তো সর্বদাই আমার প্রিয় ইমামকে খুশী করার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু আজ আমার ইমাম আমার সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, 'যদি আমরা নুরুদ্দীনকে আগুনে জ্বালাতে চাই বা পানিতে ডুবতে বলি তবু তিনি অস্বীকার করবেন না'। এটা আমার জন্য কতবড় খুশীর বিষয়!

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ

২২অক্টোবর, ১৯০৫ইং তারিখে হযরত আকদস (আঃ) সপরিবারে দিল্লী তশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আম্মাজানকে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করাবার জন্য দিল্লী নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরই হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব, হযরত (আঃ)-এর শ্বশুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত আকদস (আঃ) হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে দিল্লী ডেকে হযরত মীর সাহেবের চিকিৎসা করাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সুতরাং মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের নামে টেলিগ্রাম করা হ'ল। টেলিগ্রামে লেখা হয়েছিল, "Reach immediately" - শীঘ্রই পৌছে যাও।"

হযরত মৌলভী সাহেব নিজ ডাক্তার খানায় বসেছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দেয়া হোল। হযরত মৌলভী সাহেব টেলিগ্রাম দেখেই ততক্ষণাৎ ডাক্তার খানা থেকেই স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যেন দেরী না হয়। বাড়ীতেও গেলেন না। কাপড় বা রাস্তার জন্য টাকা নিলেন না বিছানা পত্রও না। যখন মৌলভী সাহেবের স্ত্রী খবর পেলেন তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল দিয়ে একজনকে পাঠালেন। কিন্তু টাকা পাঠাতে ভুলে গেলেন। হয়ত বা ঘরে টাকাও ছিল না। হযরত মৌলভী সাহেব স্টেশনে পৌছে গেলেন।একজন অবস্থাশালী হিন্দু ষ্টেশনে হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে দেখা করে বললেন, আমার স্ত্রী বড় অসুস্থ, অনুগ্রহ করে তাকে দেখে ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিন। মনে হচ্ছিল যেন ঐ ব্যক্তি এ অপেক্ষাই করছিলেন। মৌলভী সাহেব (রাঃ) বললেন, আমি এ ট্রেনেই দিল্লী যাব। ঐ ব্যক্তি বললেন, তবে আমি আমার স্ত্রীকে ষ্টেশনেই নিয়ে আসছি। স্ত্রীকে স্টেশনে নিয়ে আসলেন। মৌলভী সাহেব (রাঃ) রোগীণীকে দেখে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। ঐ হিন্দু ব্যক্তি বিনিময়ে হুযূর (রাঃ)-কে দিল্লী যাবার টিকেট কিনে দিলেন এবং অনেকগুলো টাকাও পকেটে দিয়ে দিলেন। এভাবে হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) দিল্লী পৌছে গেলেন। [হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) দেশবরেণ্য হেকীম ছিলেন কিন্তু রোগী দেখে ফী (পারিশ্রমিক) চাইতেন না। রোগীরা নিজেরা যে যা দিতেন তা-ই নিতেন]।

হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

তিনি ভেরায় নিজ শহরে গিয়ে বড় ধরনের চিকিৎসালয় চালু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে একটি বড় বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বিল্ডিং-এর নির্মাণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনি লাহের গিয়েছিলেন। লাহোর গিয়ে তাঁর আগ্রহ হ'ল যে, কাঁদিয়ান তো নিকটেই, কাদিয়ান গিয়ে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর সাক্ষাত করে আসি না কেন! সুতরাং তিনি কাদিয়ান যাত্রা করলেন। যেহেতু ভেরায় বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছিল তাই শীঘ্রই ফেরত আসার নিয়্যত করে বাটালা থেকে ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করলেন যে, এ গাড়ীতেই তিনি কাদিয়ান থেকে ফেরত চলে আসবেন। কাদিয়ান গিয়ে হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। হযরত মৌলভী সাহেব সুযোগ মত ফেরৎ যাবার অনুমতি চাইবেন ভাবছিলেন। কিন্তু তার অনুমতি চাইবার পূর্বেই কথা প্রসঙ্গে হযরত আকদস (আঃ) তাঁকে বললেন, "এখন তো আপনার অবসর আছে, তাই না।" তিনি বললেন, 'জ্বী হ্যাঁ, হুযূর! আমি এখন অবসর আছি।' মজলিস শেষে মৌলভী সাহেব উঠে এসে ঘোড়া গাড়ীকে বিদায় দিলেন। আজ যাওয়ার অনুমতি চাওয়া ঠিক হবে না। পরে একদিন মৌলভী সাহেবকে হযরত আকদস (সাঃ) বললেন, "মৌলভী সাহেব, আপনার একা একা থাকা কষ্টকর হবে, আপনি আপনার একজন স্ত্রীকে এখানে চলে আসতে বলুন।' তখন হযরত মৌলভী সাহেব স্ত্রীকে পত্র লিখে দিলেন, সাথে লিখলেন, হয়ত আমার তাড়াতাড়ি দেশের বাড়ীতে আসা হবে না। সুতরাং বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হোক। এভাবে অল্প দিনেই মৌলভী সাহেবের স্ত্রী এসে গেলেন।

আর একদিন হযরত আকদস (আঃ) বললেন, আপনার বই পড়ার খুব আগ্রহ আছে। অতএব, আপনার সমস্ত বইপত্র আনাবার ব্যবস্থা করুন। কিছুদিন পর হযরত আকদস (আঃ) বললেন- "আপনার প্রথমা স্ত্রীকেও চলে আসতে বলুন। তিনিতো আপনার প্রথম স্ত্রী, তিনি আপনার প্রয়োজনসমূহকে ভাল করে বুঝতে পারেন।"

কিছুদিন পরে হযরত আকদস (আঃ) একবার বললেন, "মৌলভী সাহেব, আপনি এরপর নিজের শহর ভেরার কথা মনেও করবেন না।" হযরত মৌলভী সাহেব বলতেন, আমি বড় ভয় পেলাম যে, এটা তো সম্ভব যে আমি কখনও ভেরা যাব না। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হবে যে, কখনও ভেরার কথা মনেও আসবে না।" আল্লাহ্র কত বড় মহিমা! আল্লাহ্র ইচ্ছায় ঐ দিনের পর থেকে কখনও ভেরার কথা স্মরণ হয় নি। স্বপ্নেও দেখি নি। এভাবে আমি হুযূর

আকদস (আঃ)-এর আদেশ পালনের সুযোগ পেয়ে গেলাম।

হযরত মাষ্টার আব্দুর রউফ সাহেব ভেরবী বর্ণনা করেছেন, একবার ভেরার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র লিখেছিলেন যে, আমি অসুস্থ, আপনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। অতএব, আপনি এসে আমাকে দেখে ঔষধ লিখে দিয়ে যাবেন। হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) ঐ রঈস সাহেবকে লিখলেন, আমি ভেরা হতে হিজরত করে এসেছি। এখন আমি হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত কাদিয়ানের বাইরে যাই না। আপনি আমাকে প্রয়োজনবোধ করলে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে লিখুন। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের খেদমতে পত্র লিখলে, হযরত সাহেব (আঃ) বললেন, মৌলভী সাহেব, আপনি গিয়ে ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে আসুন। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী ভেরা শহরের বাইরে রাস্তার উপরেই ছিল। অতএব, হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) অসুস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে ভেরা শহরের ভেতরে না গিয়ে দ্রুত ফেরত চলে আসলেন।

হুযূর (রাঃ) নিজ বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না, অন্য কোন ব্যক্তির সাথে দেখাও করলেন না। কেবল হযরত সাহেব (আঃ) যে কাজের অনুমতি দিয়েছিলেন সেটুকু করেই ফেরত আসলেন।

হযরত মৌলভী গোলাম রসূল রাজেকী (রাঃ)'র একটি বর্ণনা আছে ঃ

একবার এক হিন্দু কাদিয়ান এসে হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ)-কে বললেন, আমার বাড়ী বাটালা, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। আপনি আমার সাথে আমার বাড়ী চলুন। আমার স্ত্রীর জন্য ঔষধ নির্বাচন করুন। হযরত মৌলভী সাহেব বললেন, হযরত মির্যা সাহেব থেকে অনুমতি নিতে হবে। ঐ হিন্দু হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে হুযূর (আঃ) অনুমতি দিয়ে দিলেন। বাদ আসর হযরত মৌলভী সাহেব যখন হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর খেদমতে সাক্ষাতের জন্য হাজির হলেন, হযরত সাহেব (আঃ) বললেন, 'আশা করি আপনি আজই ফেরত চলে আসবেন।' মৌলভী সাহেব জবাব দিলেন, জ্বী আচ্ছা। তারপর বাটালা গেলেন, এবং রোগীণীকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। তারপর যখন ফেরত আসতে চাইলেন, তখন দেখা গেল প্রচন্ড বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট খারাপ হয়ে গেছে। সবাই বলল, মৌলভী সাহেব, এ অবস্থায় রাতে যেতে খুবই কষ্ট পাবেন। রাস্তায় অনেক পানি, কাদা তাছাড়া চোর ডাকাতের ভয় তো আছেই। আপনি আজ রাত এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যাবেন। মৌলভী সাহেব বললেন, যা হবার হোক, গাড়ী না-ও যদি পাই, তবুও পায়ে হেঁটেই চলে যাব। যে কোন মূল্যে হোক আমাকে আজ ফেরত যেতেই হবে। কারণ, আমার মালিক আমাকে আজই ফেরত যেতে বলেছেন।

ঘোড়াগাড়ীর ব্যবস্থা করা হ'ল। হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) যাত্রা করলেন। রাস্তায় বার বার নেমে পানি কাদার মধ্যে পায়ে হাঁটতে হ'ল। কাঁটা ইত্যাদি লেগে লেগে তাঁর পায়ে জখম হয়ে গেল। অবশেষে কাদিয়ানে পৌছে গেলেন।

ফযরের নামাযে হযরত আকদস (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, মৌলভী সাহেব কি রাতে ফেরত আসতে পেরেছিলেন? অন্য কেউ জবাব দেবার পূর্বেই মৌলভী সাহেব (রাঃ) অগ্রসর হয়ে উত্তর দিলেন, জ্বী হুযূর! আমি এসে গিয়েছিলাম। তিনি রাস্তায় কষ্টের কথা মোটেও উল্লেখ করলেন না। তিনি কেবল হুযূর (আঃ)-এর আদেশ পালন করা জরুরী মনে করতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) অসম্ভব রকম বিনয়ী ছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত ডাঃ জাফর হোসেন সাহেব বর্ণনা করেছেন,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে একবার বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে, হযরত মির্যা সাহেব অনেক বড় বড় দাবী করলেন। এবং পৃথক জামাত কায়েম করে ফেললেন; অথচ এর পরিবর্তে যদি তিনি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে তাদের মুসলমান বানাতে চেষ্টা করতেন তবে, আমরা তাঁর সত্যতার কথা চিন্তা করে দেখতাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় সত্যতার প্রমাণ ছাড়াই আমরা কীভাবে গ্রহণ করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-কে বললেন। এতদ্‌সঙ্গে অমুসলিমদের মধ্যে থেকে যারা হুযূর (আঃ)-এর হাতে বয়াত করে মুসলমান হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকাও প্রস্তুত করতে বললেন। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) নও মুসলিমদের একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। উক্ত তালিকায় নও মুসলিমদের পূর্বনাম ও বর্তমান নাম, জন্ম স্থান, পিতার নাম ইত্যাদি লিখলেন। আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, ঐ তালিকার শীর্ষে সর্বপ্রথম হযরত মৌলভী সাহেব নিজের নাম লিখলেন। বর্তমান নাম নূরুদ্দীন, পূর্ব নাম নূরুদ্দীন, পিতার নাম মৌলভী গোলাম রসূল। বংশ কোরায়েশী, জন্ম ভেরা, জেলা-শাহপুর ইত্যাদি।

হযরত মৌলভী সাহেব নিজের নাম সর্বপ্রথমে কেন লিখলেন কেউ কেউ জানতে চাইলেন। হুযূর (আঃ) তো নও মুসলিমদের নাম লিখতে বলেছিলেন, আপনি নিজের নাম কেন লিখলেন? হযরত মৌলভী সাহেব বড় জোরালো ভাষায় বললেন, আমি প্রকৃত অর্থে সঠিক ও প্রকৃত ইসলামকে জানতে ও বুঝতে পেরেছি – হযরত আকদস (আঃ)-এর নিকট থেকেই। তাই আমি আমার নামও তালিকায় লিখে দিয়েছি।

নিজ খেলাফত সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) অগাধ ও সুদৃঢ় ঈমান রাখতেন। অনেক ঘটনা এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) তাঁর খেলাফতের বিপক্ষে যারা ছিলেন, তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। কোন কোন সময় মসজিদে দাঁড়িয়ে নিজ খেলাফতের সপক্ষে এত জোড়ালো বক্তৃতা করেছেন যে, বিরোধী কপটরাও কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে গেছেন। একবার এমন জোড়ালো ক্রন্দন হয়েছিল যে, এক বর্ণনামতে, এমন চিৎকার উঠেছিল যেমন- মসজিদের ছাদ ফেটে যাবে এমন অবস্থা। হুযূর (রাঃ) ঘোষণা করলেন, আপনারা আমার বয়াত থেকে বাইরে চলে গেছেন। অতএব, যারা বয়াত করতে চান তারা পুনরায় বয়াত করবেন। যারা বিপক্ষে ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন একথা। কিন্তু যখন বয়াত গ্রহণ করা শুরু হোল তখন সকলেই বয়াতে শামেল হয়েছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা পরবর্তীতে জামাতে থাকলেন না, তারাও সে দিন ঐ বয়াতে শামেল হয়েছিলেন। খেলাফতের হেফাযতের ক্ষেত্রে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ছিল যা সকলেই সেদিন দেখেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) একবার বলেছিলেন, - আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন, আমি বড় জোর গলায় আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি এ জামা খুলে ফেলতে পারি না যা আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে পরিয়েছেন। যদি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এবং তোমরাও আমার বিরুদ্ধে হয়ে যাও, তবুও আমি তোমাদের কোন ভ্রূপেক্ষ করি না।"

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা
-হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

ঔষধ নম্বর-১৫
এমব্রা গ্রীসা
AMBRA GRISEA
(Ambergis-A Morbid Secretion of the whale)

এমব্রা গ্রীসা হ্যাংলা পাতলা, বিদ্বেষী মনোবৃত্তি পোষণকারী, খিট খিটে মেজাযের বদরাগী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের ঔষধ। স্পর্শকাতর মানসিকতা এর উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এতে অল্প বয়সেই ভারসাম্যহীনতা আর মাথা ঘোরানোর প্রবণতা, এতে বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক লক্ষণের মত অল্প বয়সেই ভারসাম্যহীনতা ও মাথা ঘোরার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই ঔষধটি বয়ঃজ্যেষ্ঠ রোগীদের সাধারণ রোগ বালাইয়ের ক্ষেত্রেও উপকারী সাব্যস্ত হয়।

এমব্রা গ্রীসা-র রোগী সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকলেও **দুঃখে ভারাক্রান্ত** অবস্থায় থাকে। এই ঔষধ এমনসব রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা স্বভাবতঃ দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকে, অন্ধকারে বসে থাকার প্রবণতা রাখে, কথায় কথায় ভেঙ্গে পড়ে, যারা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তারা সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের যাবতীয় লক্ষণের পাশাপাশি যদি বয়সের পূর্বেই বার্ধক্যের দৈহিক লক্ষণাবলী প্রতিভাত হয় তবে এর চিকিৎসা হলে এমব্রা গ্রীসা। এ ধরনের **রোগীদের ভীষণ মাথা ঘোরায়**। মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীতে দুর্বলতা বোধ হয়, কপালে চাপ অনুভূত হয়, মস্তিষ্কে প্রচন্ড ব্যাথা হয়, অজ্ঞান-অবশ ভাব ছেয়ে থাকে। স্মরণ-শক্তি **দুর্বল হয়ে পড়ে**। মাথার বাহ্যিক লক্ষণাবলীর মধ্যে দ্রুত চুল পড়ে যাওয়াও একটি লক্ষণ। এ ধরনের রোগীর যদি নাক দিয়ে রক্ত ঝরে তাহলে তার পরিমাণ বেশী হয়। আবার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বের হলেও এরও পরিমাণ হয় অধিক। পাকস্থলীতে প্রচুর গ্যাস হয় আর টক ঢেকুর ওঠে। কিন্তু ঢেকুরের সাথে সাথে পেটে জ্বালা পোড়া না হয়ে শীতল অনুভূতি জন্মায়। **মানসিক অস্থিরতা** এর একটি স্বাভবিক লক্ষণ। মাথায় অবশ অবশ ভাব থাকে যা সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। এমব্রা গ্রীসা-র রোগ সাধারণতঃ একই দিকে স্থির থাকে। এই প্রবণতা ব্রাইয়োনিয়া, বেলাডোনা আর স্পাইজেলিয়াতেও লক্ষ্য করা যায়। এমব্রা গ্রীসা-য় ডান কিংবা বাম দিকের কোন বিশেষ লক্ষণ নেই। যদি ডান দিকে রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা ডান দিকেই স্থির থাকবে আবার বাম দিকে রোগ দেখা দিলে বাম দিকেই থাকবে।

এমব্রা গ্রীসা-য় একটি বাহ্যতঃ আশ্চর্যজনক লক্ষণ বিদ্যমান। এর রোগী **বাজনা বা সুর-ঝঙ্কার সহ্য করতে পারে না**। এটা শুনলে তার মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পায়, স্নায়বিক চাপ আর শারীরিক কষ্ট বেড়ে যায়। এক কথায়, বাজনা আর সুর তার প্রশান্তির কারণ না হয়ে বরং তার স্নায়বিক অস্বস্তি আর অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে।

এমব্রা গ্রীসা-য় বার্ধক্যের প্রাকৃতিক লক্ষণাদি যেমন, হাত-পা ফোলা, হৃৎপিন্ডের দ্রুত সঞ্চালন, স্নায়ুতন্ত্রের ঢিলা হওয়া এসব লক্ষণ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। দুঃসংবাদের আকস্মিকতা বা হঠাৎ আঘাত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এই ঔষধ কার্যকর। আমি এই ঔষধ কয়েকবার এমন সমস্ত রোগীনির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি যারা মানসিক আঘাত প্রাপ্তির কারণে গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মানসিক আঘাত প্রাপ্তির তাৎক্ষণিক প্রতিষেধক হিসাবে 'ইগনিশিয়ার' চেয়ে উত্তম আর কোন ঔষধ নেই।

প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ ক্যাম্ফার, কফিয়া, নসভমিকা, পালাসেটিলাও ষ্টেফি সেগ্রিয়া।
সেব্য পটেন্সী ঃ ৩০ থেকে ২০০

ঔষধ নম্বর-১৬
এমোনিয়াম কার্ব
AMMONIUM CARB
(Carbonate of Ammonia)

এমোনিয়াম কার্ব অতি গভীর প্রভাবশালী আর রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি ঔষধ। অনেক বিদগ্ধ হোমিও চিকিৎসক সাপের বিষের প্রতিষেধকরূপে এমোনিয়াম কার্বকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করে এসেছেন। এতে কালো বর্ণের পাতলা রক্ত বের হয় যা দেহের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লীর নষ্ট হবার লক্ষণ। দেহের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লীর অকেজো হয়ে পড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগের আশঙ্কাজনক শেষ পর্যায়ের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে নাক, মুখ, গলা, পাকস্থলী আর নাড়ীভূঁড়ী থেকে চুয়ে চুয়ে রক্ত নিঃসৃত হতে থাকে। যদি রক্তের বর্ণ কালো হয় আর রক্ত কিছুটা পাতলা মনে হয় সেক্ষেত্রে এমোনিয়াম কার্ব এর সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সাপের কামড়েও দেহ থেকে পাতলা কিংবা ঘন কালো রঙের রক্ত পড়া আরম্ভ করে। এ কারণে **এমোনিয়াম কার্ব** হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে ধরে রাখতে পারে না সে সব ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু ঔষধ ব্যবহার করতে হয়- এই বইয়ে সেগুলোর স্ব স্ব অধ্যায়ে এর উল্লেখ বিদ্যমান। কালো রক্ত নিঃসরণ রোগের এমন এক পর্যায়ে ঘটে যা সাধারণতঃ রোগীর মৃত্যুতে পর্যবসিত হয় আর এ পর্যায়ে যদি তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না করা হয় তাহলে রোগীর জীবন রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ে। আরো এমন কিছু রোগ আছে যেগুলোতেও কালো রক্ত নিঃসৃত হয় কিন্তু আলোচ্য ঔষধের সাথে সেসব রোগের লক্ষণে যে তফাৎ রয়েছে তা মনে রাখতে হবে। তা না হলে শুধু কালো রক্তের লক্ষণ দ্বারা ফলপ্রসূ চিকিৎসা সম্ভব হবে না।

অর্শ রোগে যখন কালচে নীল রঙের রক্ত নির্গত হয় তখন এটা অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী নষ্ট হবার চিহ্ন

নয় বরং Portal System (পোর্টাল সিস্টেম) অকেজো হবার লক্ষণ। হোমিও পরিভাষায় যকৃৎ আর এর সংশ্লিষ্ট শিরা-উপশিরার ব্যবস্থাকে **পোর্টাল সিস্টেম বলে**। এগুলোর মধ্যে ময়লা রক্ত এসে জমা হয়। কোন কারণে যদি এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে আর কালো রক্ত নির্গত হয় তাহলে সালফার আর হেমোমেলিস (Hamamelis) কিংবা এ ধরনের অন্য ঔষধ লক্ষণ মাফিক কার্যকর সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি **নাড়িভূঁড়ী আর কিডনী (মুত্রাশয়)** নষ্ট হয় আর দেহের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী আর ত্বকের মিলন স্থলে যদি রক্ত নিঃসরিত হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। এমন ক্ষেত্রে এমোনিয়াম কার্বকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। এ ধরনের আশঙ্কাজনক আর বিপদসঙ্কল মুহূর্তে এটা সর্বোত্তম ঔষধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

সাপের বিষের একটি অদ্ভুত দিক হলো, এতে রক্ত জমাট বাধা আবার রক্ত নিঃসরণ উভয় ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। Orifices থেকে অর্থাৎ এমন প্রতিটি স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয় যেখানে ত্বকের সাথে অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী এসে মিলিত হয়েছে। যেমন, নখের প্রান্তে আর ত্বকের মিলনস্থলে, ঠোটের বাইরের দিকে ত্বক আর ঝিল্লীর মিলনস্থলে। ত্বক আর দেহের আভ্যন্তরীণ ঝিল্লী যে সব স্থানে মিলিত হয় সেখানে এক ধরনের সেলাই করা লাইনের মত দু'ধরনের ত্বকের প্রান্ত একীভূত হয়। এই ত্বক ও ঝিল্লীর মিলনস্থল দিয়ে রক্ত নিঃসরণ সাপের বিষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় আর এই একই লক্ষণ এমোনিয়াম কার্বেও পরিলক্ষিত হয়।

এমোনিয়াম কার্বের রোগীণিদের মাঝে মৃগী রোগের লক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর ল্যাকেসিস এর মত ঘুমিয়ে উঠলে এর রোগ বৃদ্ধি লাভ করে। প্রসবোত্তর জ্বর আর এ ধরনের আরও কিছু জ্বর মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে রোগীণিরা নানা ধরনের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখা আরম্ভ করে। এসব স্বপ্ন যাচাই করেও রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। স্বপ্নে যদি ঘন ঘন সাপের দৃশ্য দেখা দেয় তাহলে এই রোগের চিকিৎসা হলো নেট্রাম মিউর। অথচ সাপের বিষের নাম নেট্রাম মিউর নয় বরং ল্যাকেসিস। সাইলেসিয়ায় যে সব অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখা দেয় সেগুলোর একটি বিশেষ লক্ষণ হলো রোগী ঘুমন্ত অবস্থায় চলাফেরা করে। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করার পর রোগী আবার নিজের বিছানায় ফেরৎ এসে শুয়ে পড়ে। একবার সাইলেসিয়ার এক রোগীণি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের খাটের বিছানাপত্র নিয়ে আরেকটি বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হয়। সেই বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকার কারণে রোগীণি সেখানে ঢুকতে না পেরে বিছানাপত্র সেখানে ফেলে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফেরৎ নিজের খালি খাটে শুয়ে পড়ে। পরের দিন সকালে রোগীণি কিছুই মনে করতে পারে নি।

ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি ভাব থাকলে আর ঘুমানো সত্ত্বেও ঘুমের চাহিদা না মিটলে কেন ঘুম অশান্তির কারণ হচ্ছে আর কষ্ট বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে এ বিষয়টি যাচাই করতে হবে। যদি এর নির্দিষ্ট কারণ বের করা যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট ঔষধ তার সমস্ত রোগ ও কষ্ট দূর করতে সক্ষম যদি সেই ঔষধের যাবতীয় লক্ষণ রোগীতে বিদ্যমান থাকে।

কান দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পদার্থ বেয়ে পড়লে এমোনিয়াম কার্ব-এর কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কানের পুরনো রোগে এই ঔষধটি অতীব উপকারী। এর দুর্গন্ধে মৃত জীবের পচনের গন্ধ পাওয়া যায়। এর কারণ হলো, এই বিষের রোগে জীবন-ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্রান্ত অংশে কোষগুলি দ্রুত মৃত হতে থাকে। কানের ভেতরেও একইভাবে পুঁজ অভ্যন্তরীণ ঝিল্লী আর পর্দাকে গ্রাস করা আরম্ভ করে। মৃত্যুর সাথে পচন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটা বিশেষ দুর্গন্ধ আছে যা অন্যান্য সাধারণ দুর্গন্ধ থেকে পৃথক। এ ধরনের কানের রোগীর স্থায়ী চিকিৎসার জন্য এমোনিয়াম কার্ব কার্যকর।

যদি আকস্মিৎ ব্যাথা আরম্ভ হয় আর রোগী ভীষণ ছটফট করে রোগী যদি নম্র স্বভাবের হয় আর কান্নাকাটির প্রবণতা রাখে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় **পালসেটিলা** তাৎক্ষণিক ভাবে কার্যকর হয়। কানের ব্যথার পাশাপাশি যদি মেজাজ চটে যায় তাহলে ক্যামোমিলা অগ্রগণ্য। আর যদি সর্দি কানের দিকে স্থানান্তরিত হবার কারণে কানে ব্যাথা হয় তবে **এলিয়াম সেপা** সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তচাপ যদি বেশী বোধ হয় আর ব্যাথার পাশাপাশি যদি লালচে বর্ণ আর রক্তাভ পরিবেশ দেখা দেয় তাহলে পালসেটিলার সাথে **বেলেডোনা ৩০** মিশিয়ে নেয়া উচিত।

এমোনিয়াম কার্ব গ্ল্যান্ড সংশ্লিষ্ট আর টিবি জাতীয় রোগেও অতীব উপকারী। অনেক সময় ঘাড়ের গ্ল্যান্ড্‌স ফুলে শক্ত হয়ে গুটলীর আকার ধারণ করে। স্থায়ী প্রদাহ এমোনিয়াম কার্বের বিশেষ লক্ষণ। তাই এটা ক্যান্সারের গুটলীর ক্ষেত্রেও উপকারী। যদি ত্বকের রোগ ঔষধ প্রয়োগে জোরপূর্বক দাবিয়ে দেয়া হয় আর সেটা গ্ল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নেয় আর সেদিকে দীর্ঘকাল যাবৎ মনযোগ দেয়া না হয় তাহলে সেগুলোতে ক্যান্সার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমোনিয়াম কার্বও গুটলীর ক্যান্সারে উপকারী সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে গুটলীগুলো কেবল তখনই ফুলে ওঠে যখন রোগটি বাইরের স্তর পরিত্যাগ করে ভেতর দিকে ধাবিত হয়ে গ্লান্ডের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন (চলবে)।

প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ আর্নিকা, ক্যম্‌ফর
সেব্য পটেন্সী ঃ ৩০ অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী

অনুবাদঃ **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا
لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা

- চৌধুরী হামীদুল্লাহ্
ওয়াকীলে আলা তাহরীকে জাদীদ

(৫ম কিস্তি)

নেযামে শূরার বৈশিষ্ট্য

১। শূরার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই, ঐশী আদেশ পালনে উপকরণ যোগান দেয়া হয় - **শাবিরহুম ফিল আমরি ও ওয়া আমরুহুম শূরা বায়নাহুম**-অনুযায়ী।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"পাশ্চাত্য রীতির গণতন্ত্র শূরার মাপকাঠি পর্যন্ত জানে না। এর উদ্দেশ্য, এর পদ্ধতি, এর কথা-বার্তা বলার ধরন আর বিশেষ করে আল্লাহকে দৃষ্টিপটে রেখে খোদা-ভীতির সাথে পরামর্শ দেবার কোন ধ্যান-ধারণাই সেখানে পাওয়া যায় না। তাই শূরা কোন গণতান্ত্রিক সংস্থা নয় বরং আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা যা কিনা ওপর থেকে নীচে অবতরণকারী একটি সংস্থা-যা ওপর থেকে নীচে অবতরণ করে, নীচ থেকে ওপরে যায় না। গণতন্ত্র নীচ থেকে মূল (Root) থেকে উঠে" (ভাষণ ঃ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে প্রদত্ত)

৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,

"আমরা খোদার আশিসে এজন্যে সমবেত হয়েছি যে, ঐ জ্যোতিঃ, পথ-নির্দেশনা, ঐ সত্যতা যা কিনা আল্লাহ্তাআলা বিশ্বের পথ-প্রদর্শনের জন্যে পাঠিয়েছেন উহার উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা হয়, উহার প্রচারের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা হয় আর উহাকে বিস্তার দানের জন্যে প্রস্তাবনাগুলোর বিষয়ে চিন্তা করা হয়। আর এ প্রসঙ্গে যে পার্থিব, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি সৃষ্টি হয় ওগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। **কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু লাভ হয় সেজন্যে নয় বরং এজন্যে যে, সারা বিশ্বকে কল্যাণ বিতরণ করা হয়"** (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ১-২)।

৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, "এমন উদ্দেশ্যাবলী যাতে জামাতের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এসব প্রসঙ্গে জামাতের লোকদেরকে সমবেত করে পরামশ নেয়া হোক যেন কাজে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়ে যায় বা এসব বন্ধুর এসব জামাতী প্রয়োজন সম্বন্ধে জানা হয় - তাই এ মজলিসে শূরার আয়োজন" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর ভাষণ, মুশাভিরাতের ভাষণ ঃ ১৯২২ পৃষ্ঠা-৪]

৫। এভাবে তিনি (রাঃ) বলেন,

"আগের দিনে যেসব কনফারেন্স হতো তাথেকে এতে পার্থক্য রয়েছে। আর উহা এই, প্রাথমিক কনফারেন্সগুলো সদর আঞ্জুমানের সেক্রেটারী কর্তৃক আহুত হতো। কিন্তু ইহা (শূরা) খলীফা কর্তৃক আহুত হয়ে থাকে। ঐসব কনফারেন্সের কাজ সীমাবদ্ধ এবং সম্ভবতঃ রীতি ও পদ্ধতি ভিন ধরনের ছিলো; কিন্তু এর কাজ অনেক বেশী ও ব্যাপকতর আর এর কর্ম-পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ, মজলিসে মুশাভিরাতের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-৪)।

৬। তিনি আরও বলেন ঃ

"পার্থিব সংগঠন বলে, আজ কাজ করে দেখিয়ে দাও আর লোকদের সামনে রিপোর্ট দিয়ে দাও; কিন্তু আমাকে তো খোদাতাআলার সমীপে রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে। আর খোদার দৃষ্টিতো ভবিষ্যতের উপরেও রয়েছে। এজন্যে আমার চিন্তা হয় যে, আজ যে কাজ করছি ইহা যেন ভবিষ্যত কালের জন্যে ভিত্তিস্বরূপ হয়। আমাদের কাজ ইহা নয় যে, দেখুন, আমাদের কী অবস্থা হবে! বরং আমাদের কাজ ইহা যে, আমাদের ওপরে যে কাজ ন্যস্ত উহাকে এমন পদ্ধতিতে করা হয় যে, খোদাতাআলাকে বলা যায়, যদি পরে আগমনকারীরা সাবধানতার সাথে কাজ করে তাহলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং আমার চিন্তা ভবিষ্যতকে নিয়ে আর আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের ওপরে-আমরা যেন ভবিষ্যতের জন্যে ভিত্তি রচনা করি ... ভবিষ্যত প্রজন্ম এসব লোকদের ওপরে এ ভিত্তি রাখার কারণে দুরূদ পাঠ করবে ... ঐ যুগ আসবে যখন খোদা প্রমাণ করে দিবেন যে, এ জামাতের জন্যে এ কাজ ছিলো মৌলিক ভিত্তি প্রস্তর" [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর ভাষণ, মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৩০ সনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৯-২০]

৭। তিনি (রাঃ) বলেন ঃ

"অন্যান্য লোকেরা এজন্যে জলসা করে থাকে, কাড়াকাড়ি – করে স্বয়ং উপকৃত হয়। **আমরা এজন্যে সমবেত হই যে, পৃথিবীতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিষ্ঠা ও ন্যায্য-বিচারের ওপরে থাকতে বিশ্বকে বাধ্য করা হয়।** অতএব সমগ্ৰ বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি-আমরা সারা বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আমরা সারা বিশ্বের সেবাকারী আর আমাদের ওপরে আল্লাহ্তাআলার বড়ই আশিস ও অনুগ্রহ" (মজলিসে মুশাভিরাত-১৯৩০, পৃষ্ঠা ১৯-২০)

৮। "হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) শেষ সিদ্ধান্তে পৌছার পূর্বে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অভিমত প্রকাশ করতে কেবল স্বাধীনতাই দিতেন না বরং কখনও কখনও এমন বন্ধুদেরকে, যারা নীরব প্রকৃতির এবং জনগণের মধ্যে বক্তব্য রাখতে সংকোচ বোধ করেন অথচ তারা উত্তম অভিমত-পারেন - স্বয়ং ডেকে অভিমত প্রকাশ করার জন্যে উৎসাহ দিতেন। আবার এ বিষয়ও দৃষ্টিতে রাখতেন যে, কেউ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে যোগদান থেকে বঞ্চিত না থেকে যান। কতক সময় গ্রাম্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের মতামত নিতেন। কতক সময় শহুরে বা ছোট ছোট শহরের প্রতিনিধিদেরকে, কখনও ব্যবসায়ীকে ডাকা হ'ত, কখনও কারিগর বন্ধুদেরকে, কখনও উকিলদেরকে, কখনও ডাক্তারদেরকে কখনও শিক্ষকদেরকে নাম নিয়ে নিয়ে অভিমত দেবার জন্যে উৎসাহ দেয়া হতো। কড়াকড়ি যদি থাকতো তবে এতটুকু যে, চারিত্রিক সীমারেখাগুলোকে ভঙ্গ করে যেন কেউ প্রস্তাব না করে এবং ব্যক্তিগত বিষয়কে যেন টেনে না আনে" (সওয়ানেহ্ ফযলে উমর, হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮)।

৯। যুগ-খলীফা নিজস্ব সিদ্ধান্তের যোগ্যতা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যে ঘোষণা দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ আমার পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবের ওপরে চিন্তা করা ও বুঝে নেয়া যে, যে প্রস্তাব খলীফার পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে তাতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে এজন্যে এর ওপরে আমাদের আবার চিন্তা করার কী প্রয়োজন রয়েছে-কেবল ইহা মনে করা সঠিক নয়। ... আমার পক্ষ থেকে যেহেতু ইহা উপস্থাপন করা হয়েছে কেবল এ কারণে আপনারা এর ওপরে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত বের না করেন বরং আপনাদের মনের গভীর থেকে যেন এ আহ্বান বের হয় যে, এ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে তাই চুপিসারে নয় বরং সাহসিকতার সাথে কথা-বার্তা বলে নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করে...যখন এর ওপরে কাজ করার সময় এসে যায় তখন মতভেদ প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হবে না কিন্তু পরামর্শের দরজা সবার জন্যে উন্মুক্ত যেন নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৯-১০)।

১০। এভাবে তিনি আরও বলেন ঃ

"মজলিসে শূরা হোক বা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভা হোক খলীফার মর্যাদা আসলে উভয়টিতে নেতৃত্ব দেয়ার। সাংগঠনিক দিক থেকে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পথ-

প্রদর্শক এবং আইন-প্রণেতা আর বিতর্ক নির্ধারণ করার দিক থেকে তিনি মজলিসে শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যেও সদর ও পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা রাখেন" (আল্ ফযল, ২৭-৪-১৯৩৮)।

১১। স্বীয় কাজের দু'টি অংশের জন্যে যুগ-খলীফা হয়ে থাকেন- একটি অংশ সাংগঠনিক, এর কর্মকর্তা নিযুক্ত করা খলীফার কাজ ... খলীফার কাজের দ্বিতীয় অংশ নীতি-নির্ধারণী। এজন্যে তিনি মজলিসে শূরার পরামর্শ নিয়ে থাকেন। অতএব কর্মকর্তাদের মজলিস সাংগঠনিক কাজে খলীফার এমন স্থলাভিষিক্ত যেভাবে মজলিসে শূরা নীতি-নির্ধারণী কাজে খলীফার স্থলাভিষিক্ত" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ৩৬)।

১২। **যুগ-খলীফা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়কে নাকচ করে দিতে পারেন ঃ**

"কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় তো যুগ-খলীফার নিকট পরামর্শ আকারে উপস্থাপিত হয় - যেগুলোকে গ্রহণ বা নাকচ করার অধিকার তাঁর রয়েছে। তথাপি যখনই যুগ-খলীফা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়কে নাকচ করেন তখন সঙ্গে সঙ্গে কারণ বর্ণনা করে দেন। এর ফলে সকল সদস্যের তাদের সম্মিলিত রায় ও অন্তরের প্রশান্তির সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ৫৭ ও রিপোর্ট, ১৯৫৭ পৃষ্ঠা ৮৩-৯১)।

১৩। "ঐসব লোক যারা জামাতে আহমদীয়ার এ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনাকে পার্থিব মাপকাঠিতে বিচার করে এবং এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, যদি রায়সমূহকে নাকচ করার অধিকার যুগ-খলীফার থাকে তাহলে এরূপ পরামর্শের উপকারিতা কী?! আর পরামর্শের এ পদ্ধতিকে কেবল একটি পর্দা মনে করে যেন তা স্বৈরাচারকে লুকিয়ে রেখেছে। জামাতে আহমদীয়ার মজলিসে মুশাভিরাতের কার্যক্রম পাঠ করে দেখা অবশ্যই তাদের চক্ষু উন্মীলনকারীতে পরিণত হওয়ার কারণ হ'তে পারে। তারা বিস্মিত হয়ে এর মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করবে যে, যুগ-খলীফা ৯৯ শতাংশ রায়ের চেয়েও অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের রায়কে সমর্থন করেন আর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন তখন এমন শক্তিশালী দলীল নিজের মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ই নয় বরং গোটা মজলিস সম্মিলিতভাবে যুগ-খলীফার রায়কে প্রাধান্য দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়" (সওয়ানেহ্ ফযলে উমর; হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ প্রণীত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯)।

১৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ

"পরামর্শের উদ্দেশ্য ভোট গ্রহণ করা নয়। বরং কল্যাণজনক প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। পরে কতিপয় লোকের কথা গ্রহণ করা হোক বা একজন লোকের কথাই গ্রহণ করা হোক। ইহাই ছিলো সাহাবাগণের রীতি এবং কুরআন থেকেও ইহাই অবগত হওয়া যায়" (রিপোর্ট-মুশাভিরাত-১৯২২, পৃষ্ঠা-১৩)।

১৫। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ "এ ব্যবস্থাপনার কোন দৃষ্টান্ত বিধর্মী ব্যবস্থাপনায় দূরতমও পরিদৃষ্ট হতে পারে না। এর একটি সামান্য ইঙ্গিতও পরিদৃষ্ট হয় না। এ ব্যবস্থাপনা বড়ই পাক্কা। ইহা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কিত। এর ভিত্তি তাকওয়ার ওপরে। এজন্যে পরামর্শদাতা এ কথার ওপরেও জোর দেয় না যে, আমার কথা অবশ্যই যেন গ্রহণ করা হয়। সে মনে করে আমি দায়িত্ব পালন করেছি। আমি বিশ্বস্ততার সাথে যে বিষয়কে ভাল মনে করছি তা উপস্থাপন করেছি। যিনি পরামর্শ শুনেছেন তিনিও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁকে হাজির নাজির জেনে যে সিদ্ধান্ত করেন তাতে কল্যাণ হবে" (মজলিসে শূরার ভাষণ, ৯-৯-১৯৯৬, ব্রাসেলস্, পৃষ্ঠা ৮)।

১৬। এভাবে তিনি আরও বলেন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে পরামর্শের মৌলিক কারণ আর্থিক খরচাদির প্রসঙ্গে এবং এ শূরার সাথে অবশিষ্ট পৃথিবীর সংগঠনসমূহের একটি বিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সকল আইন বিষয়াদিও তাদের পরামর্শ সভাই সিদ্ধান্ত নেয় আর নির্বাচিত সংস্থাগুলো (Elected Bodies), যে কোন প্রকারেই ওগুলোর নির্বাচন হয়ে থাকুক না কেন অর্থাৎ গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে আইন পরিষদ গঠন করা হয় উহার অধিকার এই থাকে যে, সর্বপ্রকার আইন তারা তৈরী করে; কিন্তু মুসলমানদের মজলিসে শূরাতে আইন তৈরী করার কোন সুযোগ নেই। এর আলোচনা করাও সম্ভব নয় কেননা, যে সত্তা আদেশদাতা তিনি তো আইন প্রবর্তন করেই দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক মজলিসে শূরার দু'টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে-এর নাম মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট যা-ই রাখা হোক না কেন সাধারণ আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজেট ...।

মুসলমানদের জন্যে শূরার মাঝে যেহেতু আইন প্রণয়ন এই অর্থে তো সম্ভবই নয় যে, তারা খোদাতাআলা কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তে কোন হস্তক্ষেপ করে। আর এতে কিছু বাড়ায় বা এথেকে কোন কিছু কম করার প্রস্তাব করে। উহাতো চিরস্থায়ী শরীয়ত। অতএব সবচে' গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে। উহা হলো বাজেট। আর আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার লক্ষ্যে তারা আপসে পরামর্শ করার পরে সিদ্ধান্ত করে এবং এ দিক থেকে সারা জাতি বিশ্বস্ততার বাঁধনে আটকে পড়ে। এবং অবিকল এ একটি সংগঠন রয়েছে, যা কিনা আল্লাহ্‌তাআলার আশিসে জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে সবখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই মধ্যিখানে - (**আমরুহুম শূরা বায়নাহুম**) দাখিল করা খুবই গুরুত্বপূণ বিষয়-বস্তু" (খুতবা জুমুআ, ৩১-৩-৯৫ তারিখ প্রদত্ত)।

*** *** ***

নাকচকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়ের দৃষ্টান্ত

১। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন ঃ "এক জুমুআর দিনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে নিয়ে জুমুআর পর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ করেন। তিনি মুহাজিরদের সাথে পরামর্শ করেন যে, উহুদের যুদ্ধের জন্যে আমরা মদীনায় বসে যুদ্ধ করবো নাকি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করবো। মুহাজিরদের অধিক সংখ্যক লোকের পরামর্শ ছিলো আমাদের মদীনা থেকেই যুদ্ধ করা উচিত। আনসারদেরও অধিকাংশ লোকের মতামত ছিলো যেন মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করা হয়; কিন্তু আনসারদের কতিপয় যুবক, তাদেরকে কোনভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা যায় না, নিজেদের যৌবনের তেজ ও কুরবানীর আবেগে এবং ত্যাগের মহিমায় ও শহীদ হওয়ার প্রেরণায় পরামর্শ দিলেন, হুযূর যেন মদীনার বাইরে গিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন। ঐসব যুবক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। এজন্যে সম্ভবতঃ তাদের ধারণা ছিলো, যদি মুসলমানরা কাফিরদের মোকাবেলায় মদীনা থেকে যুদ্ধ করে তাহলে সম্ভবতঃ কাফিররা মদীনা অবরোধ করে ফেলবে এবং সম্ভবতঃ তারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে ফিরে চলে যাবে। তাদের প্রাণে এ লিপ্সা ছিলো যে, যুদ্ধ হোক, আমরা কিছু মেরে ফেলি এবং আমাদের মধ্য থেকে কিছু শহীদ হোক যাদের ভাগ্যে শাহাদত লেখা হয়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঐ যুবকদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং বড় বড় মুহাজির ও আনসারদের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তাঁর (সঃ) এরূপ করার মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা নিহিত ছিলো এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে যে, প্রজ্ঞাগুলো কী ছিলো" [রিপোর্ট মুশাভিরাত, ১৯৭৬ (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭, সংক্ষিপ্ত]

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতামতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার প্রসঙ্গে ১৯৩৬ ঈসাব্দের মজলিসে মুশাভিরাতে কতিপয় দৃষ্টান্তের সাথে বলেন ঃ (ক) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সালমাহ্ (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন এবং পুরুষদের অধিকাংশের মতামতকে নাকচ করে দেন।

(খ) ... হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উসামা (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায়কে নাকচ করেন।

(গ) প্রস্তাব ছিলো যে, প্রাদেশিক আমীর যদি কোথাও থাকে আর সেখানকার স্থানীয় আমীর অন্য কেউ হয় তাহলে জুমুআর নামায পড়ানোর আসল অধিকারী হবেন স্থানীয় আমীর। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেন ঃ প্রাদেশিক আমীর যেখানেই থাকুন কেন জুমুআর খুতবা দেবার অগ্রাধিকার তারই" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ৫৭)।

[টীকা ঃ এ বিষয়ের নির্দেশাবলীর জন্যে দেখুন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী - রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ৭৭, খুতবা জুমুআ, ২৯ মার্চ, ১৯৯৬, আরও আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ১৭-২৩, মে ১৯৯৬ পৃষ্ঠা ৮ দ্রষ্টব্য]

৩। ১৯২৬ সনের মুশাভিরাতে একটি প্রস্তাব এসেছিলো - নেযারতে দাওয়াত ও তবলীগকে অনুমতি দেয়া হোক যে, উহা হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর ভ্রমণসূচী প্রস্তাব করে ওগুলোর ওপরে ব্যবস্থা নেয়। এ প্রস্তাবের পক্ষে ১০৫ ও বিরুদ্ধে ৭৫টি ভোট ছিলো। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়কে নাকচ করে বলেন। ...

(রিপোর্ট শূরা ১৯২৬, ছাপা হয়েছে আহমদীয়া গেজেট, কাদিয়ান, ১১-৩-১৯২৭, পৃষ্ঠা ২৬-৩০)

৪। একবারের প্রস্তাব ছিলো, করাচী লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিকে স্থানীয় প্রয়োজনের জন্যে তাদের চাঁদার এক তৃতীয়াংশ গ্রান্ট হিসেবে দেয়া হোক। উহাকে নিজের পক্ষ থেকে নাকচ করার পরিবতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রস্তাবের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ ও নেতিবাচক ফলাফলগুলো দলীল প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত ১৯৫৭, পৃষ্ঠা-৯১)।

(৯-১৫ মার্চ-২০০০ তারিখের আল্ ফযল ইন্টার ন্যাশনালের সৌজন্যে) (চলবে)

অনুবাদ-**মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

অমৃতবাণী (চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

নৈকট্য লাভের অনুপাত জবাবদিহি করতে হবে

একথা আমি বার বার বলেছি যে, কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ নৈকট্য লাভ করবে সে অনুপাতে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আহ্‌লে বায়ত [রসূল করীম (সঃ)-এর পরিবারবর্গ] অধিক জবাবদিহিতার পাত্র ছিলেন। যারা দূরে রয়েছে তাদের জবাবদিহিতা নেই। কিন্তু তোমাদের অবশ্য তা রয়েছে। যদি তাদের ওপর ঈমানের দিক থেকে তোমাদের কোন প্রাধান্য না থাকে তাহলে তাদের ও তোমাদের মধ্যে কী পার্থক্য? হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ। তারা গভর্ণমেন্টের গোয়েন্দাদের ন্যায় তোমাদের গতি-বিধি ও ক্রিয়া-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছে, আপনারাও কি মসীহ্ (আঃ)-এর সহচরদের ন্যায় সাহাবীগণের সমকক্ষ হতে চলেছেন? যদি না হয়ে থাকেন তবে আপনারা শাস্তি পাবার যোগ্য, যেন প্রারম্ভিক অবস্থায় রয়েছেন আপনারা; কিন্তু মৃত্যুর কি নিশ্চয়তা আছে? মৃত্যু একটি নিশ্চিত বিষয় যা প্রত্যেকের নিকট আসবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আপনারা উসাদীন রয়েছেন কেন? কেউ যদি আমার সাথে সম্বন্ধ না রাখে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু যখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, আমার দাবীকে স্বীকার করেছেন এবং আমাকে মসীহ্ বলে মান্য করেছেন, প্রকারান্তরে আপনারা সাহাবাগণের সমকক্ষ হবার দাবী করছেন তাহলে সাহাবাগণ কি সততা ও বিশ্বস্ততার পথে পদবিক্ষেপে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেছেন? তাদের মধ্যে কি কোন শৈথিল্য ছিল, তারা কি মনে কষ্ট বোধ করতেন; নিজেদের আবেগের ওপর কি তাদের প্রাধান্য ছিল না, তারা কি বিনয়ী ছিলেন না? বরং তাদের মধ্যে উন্নত মানের বিনয় নিহিত ছিল। সুতরাং দোয়া করতে থাকো যেন আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকেও অনুরূপ সামর্থ্য দান করেন, কারণ আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে বিনয় ও দীনতার জীবন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ শিশুদের ন্যায় নিজেকে দুর্বল মনে হলে তখন ঘাবড়িও না। "তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর" সাহাবাগণের ন্যায় এই দোয়া অব্যাহত রাখ।

রাতে ওঠো এবং দোয়া কর

রাতে ওঠো এবং দোয়া কর যেন আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে আপন পথ প্রদর্শন করেন। আঁ-হযরত (সঃ)-এর সাহাবীগণও পর্যায়ক্রমে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন। প্রথমে তারা কী ছিলেন? একজন কৃষকের বপন করার ন্যায় ছিলেন। পরবর্তীতে আঁ হযরত (সঃ) জলসেচন করেছেন। তিনি (সঃ) তাদের জন্যে দোয়া করেছেন। বীজ খাঁটি ছিল এবং জমি উর্বর ছিল। ফলে এ জলসিঞ্চনে উত্তম ফসল ফলেছে। তারা রসূল করীম (সঃ)-এর আচরণের অনুকরণ করেছেন। তারা দিন বা রাতের অপেক্ষায় থাকতেন না। তোমরা খাঁটি অন্তরে তওবা কর। তাহাজ্জুদের সময় ওঠো, দোয়া কর, মনকে শুদ্ধ কর, দুর্বলতা পরিহার কর এবং **খোদাতআলার সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী আপন কথা ও কাজের সমন্বয় সাধন কর**। দৃঢ়-বিশ্বাস রাখবে যারা এই উপদেশ পালনের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং কার্যত: দোয়াতে রত থাকবে এবং বাস্তবে খোদার সমীপে নিজের প্রার্থনা নিবেদন করবে আল্লাহ্‌তাআলা তার প্রতি আশিস বর্ষণ করবেন এবং অন্তরে পরিবর্তন সাধিত হবে। খোদাতাআলা থেকে নিরাশ হয়ো না।

মানুষকে ওলী হতে হবে

"মহান করুণাময়ের নিকট কিছুই কঠিন নয়"। কেউ কেউ বলে থাকে, "কি ওলী (খোদার বন্ধু)হতে পারবো"? আফসোস! তারা বিষয়টিকে কোন গুরুত্বই দেয় নি। নিঃসন্দেহে মানুষকে (খোদার) ওলী হতে হবে। যদি সে সিরাতে মুস্তাকীমে (সরল-সুদৃঢ় পথে) চলে তা'হলে খোদাও তার প্রতি এগুতে থাকবেন, এবং পরে এক স্থানে তাদের সাক্ষাৎকার হবে। যদিও সে তাঁর দিকে ধীরগতিতে এগুতে থাকে কিন্তু খোদাতাআলা তখন অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবেন। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি এ আয়াতটি ইংগিত করছে-ঃ এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব" (২৯:৭০)। সুতরাং যে সব কথা আমি আজ নির্দেশস্বরূপ বলেছি তা স্মরণ রাখবে যে, এর ওপরই (মুক্তিলাভের) অবস্থান। খোদা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি তোমাদের ব্যবহার এরূপ হতে হবে যাতে সম্পূর্ণরূপে তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে। সুতরাং এদ্বারা তোমাদেরকে "এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখনো তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই" - (৬২ঃ৪) এর অনুরূপ হতে হবে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

মিনহাজুত্তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(৩০তম কিস্তি)

এ ১৪টি কথায় ইচ্ছা-শক্তির শক্তি লাভ হয়ে থাকে। উহা আবেগ ও উদ্দীপনাকে দাবিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু শর্ত এই যেন মানুষ এসব কথার ওপরে পরিপূর্ণভাবে চিন্তা-ভাবনা করে।

৪। চতুর্থ চিকিৎসা হলো ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করা বা এর পথ থেকে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করা। অর্থাৎ যেসব দোষ-ত্রুটি দূর করতে হয় তা দূর করা। এর ওপরে একেবারে প্রথম দিন থেকেই অভিযান আরম্ভ করে দেয়া। যখন সেনাবাহিনী কোন স্থানে আক্রমণ করে তখন প্রথম আক্রমণেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। এভাবেই কোন মন্দ দূর করার ব্যাপারেও করা উচিত। অর্থাৎ যে মন্দ দূর করা দৃষ্টিতে থাকে এর ওপরে পুরো জোর ল্যাগানো উচিত।

৫। পঞ্চম চিকিৎসা এই যে, পুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করা দরকার, উহার অভ্যাস করে বা যে স্বভাব পরিত্যাগ করা উচিত তার বিপরীত অভ্যাসের অনুশীলন শুরু করে দেয়। যেমন, যদি রাগ ওঠে তাহলে কোমলতার অনুশীলন করে।

৬। চিন্তা ও ধ্যানের অভ্যাস করে। তরিঘড়ি করে কাজ না করে। আগেই তার মধ্যে যেসব অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এতদ্দ্বারা উহাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। কেননা, অভ্যাসগুলো তরিঘড়ি করার স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণ করে থাকে আর চিন্তা-ভাবনা করে কাজে করলে সে আক্রমণ করতে পারে না।

৭। যা করার বা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে উহার পুরোপুরি মাহাত্ম্যকে মাথায় রাখার জন্যে চেষ্টা করে এবং উহার সকল দিকের ওপরে চিন্তা করে। এমন কি যে, উহার একটি পরিপূর্ণ নক্শা তার মনে অঙ্কিত হয়ে যায়। এর ফল এই দাঁড়াবে, যে কাজ করতে হবে উহা সে নির্বিঘ্নে করতে পারবে আর যা পরিত্যাগ করতে হবে তা অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারবে।

৮। যেসব বিষয় বৈধ ওগুলোর প্রতি তার আকর্ষণ হয়। ওগুলোকে কোন কোন সময় পরিত্যাগ করে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার অভ্যেস সৃষ্টি হয়। যেমন, এক ব্যক্তির চুরির অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আর দূরীভূত হয় না। তাই তার উচিত কতক বৈধ বিষয়কে, যার দিকে তার ঝোঁক আছে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া আরম্ভ করে দেয়। যেমন, কোন এক সময়ে মনে চাইলো ঘুমাই। অথচ ঘুমালো না। একটি জিনিষ খেতে মন চাইলো অথচ খেলো না। এভাবে মনে শক্তি সঞ্চার হতে থাকবে। হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথা আছে। আমি এর এ অর্থই বুঝি। তিনি (রাঃ) বলেছেন-**'আরাফ্তু রব্বি বি ফাসখিল 'আযাইমি** অর্থাৎ আমি দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বার বার ছিন্ন করে আমার খোদাতাআলাকে চিনেছি। এর অর্থ ইহা যে, আমি কোন কোন ইচ্ছা করেছি তা সফল হয় নি আবার আমি ইচ্ছা করেছি পুনরায় বিফল হয়েছি। কিন্তু যখন আমি বার বার ইচ্ছাগুলোকে বিফল হতে দেখা সত্ত্বেও ওগুলোকে করা ছেড়ে দেই নি এবং সাহস হারাই নি তখন আমি খোদাতাআলাকে লাভ করেছি। যদি আমি ইচ্ছাকে ভঙ্গ করে ফেলার পরে নিরাশ হয়ে বসে যেতাম তাহলে পরে সংকল্প করতাম না। তখন আমি খোদাতাআলাকেও পেতে বিফল মনোরথ হতাম।

৯। মানুষের বার বার নিজ আত্মাকে নিরীক্ষণ করা। যেভাবে একজন চিকিৎসক রোগীকে বার বার দেখে থাকেন। এভাবেই সে নিজ আত্মাকে দেখে।

১০। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। মাঝামাঝি অবস্থায় যেন পরিতৃপ্ত না হয়। যে বস্তু লাভ করতে চায় উহার চূড়ান্ত সীমার প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ মার্গের ইচ্ছা পোষণ করে তার কিছু না কিছু লাভ হবেই। এভাবে মানুষ নিজ আত্মার ওপরে বিজয় লাভ করে।

এ চেষ্টা ছাড়াও আরও একটি ফর্মূলা রয়েছে। আর তা হ'ল দোয়ার ফর্মূলা। যখন মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কোন কিছুই না হয় তখন তার বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রথম বিষয় হ'ল নিজের চেষ্টা যা অন্য কথায় অভ্যন্তরীণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা। আর অন্যটি হ'ল বাহ্যিক সাহায্য। মানুষ নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে এবং সাথে সাথে খোদার নিকট দোয়াও করে যে, আমার দ্বারা যা কিছু হতে পারতো তো হচ্ছে। এখন তিনি সাহায্য করলেই কাজ হতে পারে। একজন বুযুর্গের বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। তাঁর একজন শীষ্যের সুফী-তত্ত্বের প্রতি খুবই ঝোঁক ছিলো। সে তা শেখার জন্যে অনেক দিন তাঁর নিকট অবস্থান করলো। যখন সে ফিরে যেতে লাগলো তখন ঐ বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশে কি শয়তান আছে? সে অবাক হয়ে বলতে লাগলো, শয়তান আবার কোথায় না আছে। বুযুর্গ বল্লেন, যখন তুমি তোমার দেশে পৌছুবে তখন শয়তান যদি তোমাকে আক্রমণ করে তাহলে তুমি কী করবে? সে বল্লো, আমি তার মোকাবেলা করবো। বুযুর্গ বল্লেন, ভাল কথা, তুমি শয়তানের সাথে মোকাবেলা করলে আর সে পালিয়ে গেলো। কিন্তু পুনরায় তুমি খোদাতাআলার দিকে ধ্যান নিবদ্ধ করতে লাগলে সে পেছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেল্লো, তখন কী করবে? সে বল্লো, আমি পুনরায় তার মোকাবেলা করবো। বুযুর্গ বল্লেন, যদি তুমি এভাবে শয়তানের মোকাবেলা করতে থাকো তখন খোদাতাআলার প্রতি কীভাবে ধ্যান নিবদ্ধ করতে পারবে? সে বল্লো, তাহলে পরে আপনিই বলুন, কি করা উচিত? তিনি বল্লেন, বলো, যদি তুমি কোন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাও যার বাড়ীতে একটি কুকুর রয়েছে এবং সেটা তোমাকে আক্রমণ করেছে, তখন কী করবে? সে বল্লো, আমি তাকে লাঠি দ্বারা পেটাবো। তিনি বল্লেন, কুকুর ভেগে গিয়ে যদি পুনরায় তোমাকে আক্রমণ করে বসে তখন কী করবে? সে বল্লো, বাড়ীর মালিককে ডাকবো, এস! তোমার কুকুরকে শামলাও। তিনি বল্লেন, শয়তানের ব্যাপারেও এ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। খোদাতাআলাকে বলতে হবে, আমি তোমার নিকট আসতে চাই, কিন্তু শয়তান আমাকে আসতে দিচ্ছে না। তুমিই একে দূর করো।

অতএব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম ইহাও যে, মানুষ দোয়া করে, হে খোদা! আমি নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। এখন তোমার সাহায্যেরই আমি প্রত্যাশী।

দশম কথা আমি এই বলেছিলাম, মানুষ যেন নিজ উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখে। এক বন্ধু এর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে, উচ্চ কামনা-বাসনাও কি বৈধ? আমার দৃষ্টিতে ইহা বৈধ নয়। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও লিখেছেন, ওহী ইলহাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যসমূহ উচ্চ হওয়া আর কোন ব্যাপারে আশা ও ঈর্ষার মধ্যে বড়ই পার্থক্য রয়েছে। ঈর্ষার তাৎপর্য এই, মানুষ ভাল জিনিষ দেখলে তা পাবার জন্যে লালায়িত হয় যে, যদি তা পেতাম। কিন্তু উদ্দেশ্য বলতে বুঝায়, যা আগে থেকে নির্ধারণ করে নেয়া হয়। আবার ইহা পাওয়ার জন্যে চেষ্টাও করা হয়। যে লোভী সে তো কেবল ফকিরের মত হাত পেতেই থাকে কিন্তু যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে কাজ করে সে-তো উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন এবং অধিক সাহসের অধিকারী।

ইলহাম প্রত্যাশীর অবস্থাও ইহাই। ইলহাম এক প্রকার আহ্বান যা কিনা খোদাতাআলা তাঁর কোন বান্দাকে দিয়ে থাকেন। এখন যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি অমুক বন্ধুর সাথে তার ওখানে ভাল দাওয়াত খাবার জন্যে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি; তখন ইহা কতইনা খারাপ কথা হবে এবং সকলে তাকে মন্দ ভাববে। কিন্তু যদি কেউ বলে, আমি অমুক বন্দুর সাথে সাক্ষাৎ করতেই যাচ্ছি। সেখানে যত ভাল দাওয়াত লাভই হোক না কেন! তাকে কেউ মন্দ বলবে না। ইলহামের প্রত্যাশীর অবস্থাও তা-ই। যখন কেউ দোয়া করবে, হে খোদাতাআলা! আমাকে উচ্চ মার্গে পৌছে দাও এবং তোমার নৈকট্য দান করো তখন ঐ মর্যাদা লাভ হলেই তার ইলহামের দাওয়াত লাভ হবে। কিন্তু কেউ যদি এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমার ওপরে ইলহাম হোক তখন এর অর্থ এই হবে যে, সে এ আহ্বানের প্রত্যাশী। খোদাতাআলার নৈকট্যের প্রতিও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এজন্যে ইলহাম লাভের প্রত্যাশা করা সঠিক নয়। (চলবে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

এম.টি.এ ডাইজেস্ট

(সেপ্টেম্বর ১-৩০,২০০০)

সন্তানদের তরবিয়তের জন্য রাবওয়া বা কাদিয়ানে প্রেরণ

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে একটি প্রশ্নোত্তর সভা সম্প্রচারিত হয় যা জার্মানীতে খুব সম্ভবতঃ ১.৯.২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, জার্মানীর কোন কোন আহমদী পরিবার তাদের সন্তানদের পাকিস্তানে রেখে বড় করতে চান বা করছেন এ অজুহাতে যে জার্মানীতে সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) কী মনে করেন? হুযূর (আইঃ) বলেন, আসল বিষয় হ'ল পিতা-মাতা। যদি পিতা-মাতার মধ্যে ত্রুটি থাকে তাহলে রাবওয়া কাদিয়ানে পাঠিয়েও কোন লাভ হয় না। বস্তুত ঘরে তরবিয়তের উত্তম পরিবেশ তৈরী করলে ঘরই জান্নাত হয়ে থাকে। যারা সন্তানদের দূরে ঠেলে দেয় তারা বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়। দোয়ার সাথে নিজের সন্তানদের তরবিয়তের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

বয়াতের সর্বোচ্চ টার্গেট

এ অনুষ্ঠানে আরেকটি প্রশ্ন ছিল এ বছর কোন দেশে বয়াতের টার্গেট সবচে' বড়। হুযূর (আইঃ) বলেন, ইউরোপে জার্মানীর আর এলাকা হিসেবে আফ্রিকার টার্গেট সবচে' বড়। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে বেনিনের সাথে বাকি দেশগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। বেনিন ও ঘানার মধ্যে চ্যালেঞ্জ চলছে। বর্তমানে বেনিন এগিয়ে। হতে পারে পুরো দেশই আহমদীয়ত গ্রহণ করবে। আবার একদিক ভারী হ'লে পরে অন্য দিকেও ঝুঁকে। তাই অন্য দেশও এগিয়ে যেতে পারে।

ভিন গ্রহবাসী (alien)-দের সাথে সাক্ষাৎ

এ অনুষ্ঠানে ভিন্ন গ্রহের চিন্তাশীল প্রাণীদের সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, বর্তমানে যেভাবে বলা হয় বা কল্পনা করা হয় মহাশূন্য থেকে saucer (চ্যাপ্টা আকৃতির অজ্ঞাত নভোযান) বা অন্য কোন বাহনে ভিন গ্রহবাসীরা আসে ইত্যাদি–এগুলো ঠিক নয়। তবে মহাকাশে চিন্তাশীল প্রাণী আছে তা কুরআনের ভাষ্যমতে নিশ্চিত। তাদের সাথে যোগাযোগও হবে তবে তা কোন যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে নাকি অন্য কোন গ্রহে গিয়ে নাকি আরো ভিন্ন কোন উপায়ে তা বলা যায় না। তবে যোগাযোগ অবশ্যই হবে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট।

ওয়াক্‌ফে নও এর তাহ্‌রীক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ

এক ব্যক্তি এ প্রশ্নোত্তর সভাতেই প্রশ্ন করেন, ওয়াক্‌ফে নও এর তাহ্‌রীক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন, অবশ্যই এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর এর মধ্যে জামাতের দ্রুত উন্নতির সুসংবাদও ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা যেন বলছিলেন, "প্রস্তুতি নিয়ে নাও সামনে অনেক ভারী দায়িত্ব ন্যস্ত হ'তে চলেছে।"

পাকিস্তানের অবস্থা

পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, এতদিন কেউ কেউ বলতো, আর্মির সমর্থনের অভাবে আহমদীদেরকে কিছু করা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন মোল্লারা আর্মির ঘাড়ে চড়ে বসেছে। তারা যত চেষ্টা করে করুক শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলা যা চাইবেন তা-ই হবে- **ফা'আলুল্ লিমা ইউরীদ।**

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন, বিশ্বের বড় বড় শক্তি ধ্বংস হবে। ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপক হবে, কিন্তু সব মানুষ ধ্বংস হবে না।

এক সারিতে ইমাম-মুক্তাদি

অনেক সময় জামাত খুব ছোট হ'লে বা স্থান সংকুলান না হলে ইমামের সারিতেই মুক্তাদিরা দাঁড়ান। এরূপ ক্ষেত্রে ইমামের কি এক সাথেই দাঁড়ানো উচিত নাকি এক কদম সামনে - এটি জানতে চাওয়া হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, আমার মতে একসাথেই দাঁড়ানো উচিত, এক কদম সামনে নয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) পাশে উপবিষ্ট মসজিদ ফযল, লন্ডনের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর পিতা মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের কী মত ছিল। তিনি বলেন, তাঁর এরূপই মত ছিল।

নেযামের বিরোধিতাকারীদের জন্য বদ্‌দোয়া করা উচিত কিনা

১৯শে সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত (১২ই সেপ্টেম্বর ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি জানতে চান, জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা যারা করেন, তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করা উচিত কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন, বড় জোর "আউযুবিল্লাহ্ ..." বলে তাদের থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া উচিত। তারা শয়তানের প্রতীক। আল্লাহ্‌ই তাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কুরআনে শয়তানের বংশধর বলতে মানুষকেই বুঝানো হয়েছে।

ঘুষপূর্ণ এ জগতে চলার উপায়

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন প্রশ্ন করেন, বর্তমান জগতে ঘুষের ছড়াছড়ি এর মধ্যে কীভাবে চলবো। হুযূর (আইঃ) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'কুকুরের জন্য হাড্ডি' হিসেবে কিছু দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রের বা অপর ব্যক্তির সম্পদ হরণ বা অন্যায় সুবিধা লাভের জন্য নয়।

বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাআত

১৯শে সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত (১২ই সেপ্টেম্বর ধারণকৃত) 'বাংলা মুলাকাত' অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয়, বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাআত পৃথক পড়া সঠিক নাকি এক সাথে পড়া। হুযূর (আইঃ) বলেন, দু'ভাবেই পড়া যায়। তবে আমার মতে দু' রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাআত পৃথক পড়াটাই শ্রেয়।

Siamese twins এর করণীয়

কখনো কখনো এমন জোড়া শিশুর জন্ম হয় যাদের মাথা দু'টো, কখনো হাত বা পা দু' জোড়া হলেও হৃদপিন্ড, ফুসফুস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (vital organ) একটা করেই থাকে অর্থাৎ তাদের দেহ একটাই। এদেরকে Siamese twins বলা হয়। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে অপরজনকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সম্প্রতি আমেরিকাতে এ ধরনের একটি ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত প্রশ্ন করা হ'লে হুযূর (আইঃ) বলেন, এখানে দু'জনকে এক সাথে জীবিত রাখা সম্ভব নয়। যেহেতু বিচ্ছিন্ন না করলে উভয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেহেতু বৃহত্তর স্বার্থে একজনকে বিচ্ছিন্ন করাটাই উচিত।

অন্য জাতির অনুসরণ

২৬শে সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত (১৯শে সেপ্টেম্বর ধারণকৃত) 'বাংলা মুলাকাত' অনুষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষামতে অন্য জাতির অনুসরণ করতে যে নিষেধ করা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ জানতে চাওয়া হ'লে হুযূর (আইঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল পাপের ক্ষেত্রে, মন্দ বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, এবং এক সময় সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন মান্যকারী জ্ঞানের ময়দানে অস্বীকারকারী জাতিসমূহের মুখ বন্ধ করে দিবে।

শিশুদের জন্মদিনে ছোট উপহার দেয়া

আমরাতো জন্মদিন পালন করি না। তবু শিশু যখন ছোট থাকে, তাদেরকে কি জন্মদিনে ছোট-খাট উপহার দেয়া যেতে পারে- এ প্রশ্ন ৩০শে সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত (২৩শে সেপ্টেম্বর ধারণকৃত) জার্মান মুলাকাত অনুষ্ঠানে করা হয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, দেয়া উচিত নয়। তাদেরকে বুঝানো উচিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বা খলীফাগণ কারো জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয় নি। আমরা কে যে আমাদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে হবে? আর কোন্ খুশিতে জন্মদিন- আমরা কি জানি এ সন্তান বড় হয়ে ভাল হবে না মন্দ হবে? আর আসল কথা হ'ল এই যে, একবার কোন বাহানায় উপহার দেয়া শুরু করলে প্রতি বছরই দিতে হবে- কেননা সেই সন্তানের মনে একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি হবে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্য কি ওহী আবশ্যক

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্য ওহী লাভ করা আবশ্যক কিনা। নাকি সত্য-স্বপ্ন যথেষ্ট। হুযূর (আইঃ) বলেন, কোন নির্দিষ্ট কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়, কেবল এটা ছাড়া যে, আল্লাহ্‌তাআলা অন্তরকে প্রশান্ত করুন। এরপর কীভাবে করবেন আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দিন।

সংকলন - আব্দুল্লাহ্ শাম্‌স বিন তারিক

কবিতা

আল্লাহ্‌র অভিমত

কথা কম কাজ বেশী,
এর উপর থাকলে ভালবাসা
আসিবে না জীবনে কোন দুর্দশা।
হাতে কাজ মুখে দোয়া
থাকলে সদা-সর্বদা
দূর হবে সব দুর্বলতা
সদয় হবেন বিধাতা।
থাকলে সদয় বিধাতা
দূর হবে সব বক্রতা।
কু-ধারণার তাবেদার
হয় শিকার বক্রতার।
হয় যারা বক্রতার শিকার
তারাই করে সত্যকে অস্বীকার।
তা না হলে প্রকৃত মু'মিন হবে
সত্যি কথা বলতে লাগে
কেন এত ভয় ?
তা কি কেউ বলতে পারেন
এমন কেন হয়?
জন এমন আছে অনেক
যারা দাঁড়িয়ে খোদার ঘরে
খোদারি খেলাপ বয়ান করে
যদিও তারা নামায পড়ে।
ইহুদী-নাসারার চালে পড়ে
তারা এরূপ বয়ান করে
যদিও তারা কুরআন পড়ে।
তাই মোরা দিবারাত-
করি মোনাজাত
আমাদের দ্বারা পায় যেন তারা
রাহে নাজাত।
নাজাতের একই পথ আল্লাহ্‌র রহমত
– ইসলামী খেলাফত।
ইহাই আল্লাহ্‌র অভিমত।
শান্তি ও মুক্তির একই পথ
ইসলামী খেলাফত

- শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ, ঢাকা

আহাদুন আহাদুন

আহাদুন আহাদুন
রসূলের প্রিয় বেলালের ধ্বনি,
আহাদুন আহাদুন।
জালিমের শত জুলুমে কাতর
আহমদী মজলুম।
সেই বেলালী-রূহের হৃদয়ের ধ্বনি,
আহাদুন আহাদুন।
আহাদুন আহাদুন
আজ লাখো মু'মিনের প্রেরণার ধ্বনি,
আহাদুন আহাদুন।

- সিকদার তাহের আহমদ, রাজশাহী

আমাদের চাঁদা
(১১তম কিস্তি)

দরবেশ ফান্ড ঃ ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) যখন কাদিয়ান থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন তখন কাদিয়ানের হেফাযতের জন্যে তিনি জামাতের নিকট ৩১৩ জন আহমদীর নাম পেশ করার তাহরীক করেন যারা মরণ কবুল করে কাদিয়ানে বসবাস করবেন এবং কাদিয়ানের হেফাযতের জন্যে দোয়া করতে থাকবেন। হুযূর (রাঃ)-এর তাহরীক অনুযায়ী ঐ সময়ে যে ৩১৩ জন আহমদী নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছিলেন তারা 'দরবেশ' নামে পরিচিত। এখন কাদিয়ানের বাসিন্দাদের অধিকাংশই সেইসব দরবেশগণের বংশধর। আনন্দের বিষয় বাংলাদেশ থেকেও এ মহান কাজে কয়েকজন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দরবেশ উমর আলী (ঘাটুরা), দরবেশ আব্দুল সালাম (বৈরাগীর চর), দরবেশ ওসমান আলী (নারায়ণগঞ্জ), দরবেশ তৈয়্যব আলী (প্রেমারচর) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দীর্ঘ কাল সেবা করার পরে দরবেশ আব্দুস সালাম ও দরবেশ উসমান আলী খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশে দেশে ফিরে আসেন। পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির পরে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের ওপরে আঞ্জুমানের কর্মচারী ও অফিসাদি সম্পর্কে সাধারণ খরচাদি বাদেও অবস্থার চাহিদানুযায়ী কাদিয়ানে স্থায়ী দরবেশগণের প্রতিও দায়িত্বাবলী পালন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আয় ছিলো খুবই অপ্রতুল। তাই সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ও কামরুল আম্বিয়া সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম,এ (রাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫২ সনে "দরবেশ ফান্ড" নামে একটি চাঁদার প্রবর্তন করা হয়। এতে দরবেশগণের সাধারণ প্রয়োজন যেন মিটানো যায়। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেনঃ "বহির্দেশীয় জামাতগুলো নিজেদের ভাইদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। বিশেষ করে কাদিয়ানে যে "আস্হাবে সুফ্ফা"(অর্থাৎ এখানে দরবেশগণ-প্রবন্ধকার) রয়েছেন তাদের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য যেন তিনি নিজের জন্যে যে খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করেন এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাদের জন্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি খাদ্যশস্য সদকা হিসেবে যেন না দেন বরং এক ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুরবানী-স্বরূপ প্রেরণ করেন। তারা যেন ইহা মনে করেন যেভাবে মানুষ নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, খাওয়ানোকে মানুষ অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে থাকে তেমনিভাবে জামাতের দরিদ্রকে সাহায্য দান করা আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে তাদের ওপরে অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তারা এ কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যে খাদ্য-শস্য দিয়ে যাচ্ছেন।"

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে কাদিয়ানকে জনবসতিপূর্ণ রাখা গোটা জামাতের কর্তব্য। কিন্তু নিয়তির অমোঘ ঐশী বিধান অনুযায়ী একটি অংশকে কাদিয়ান থেকে বের হ'তে হয়েছে এবং অন্য একটি অংশের কাদিয়ানে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ হয় নি। কেবল স্বপ্ন-সংখ্যক লোকের এ সৌভাগ্য লাভ হয়েছে যে, তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে কাদিয়ানে অবস্থান করে ধর্মের সেবা করে যাচ্ছেন।

সুতরাং অন্যান্যদের কর্তব্য তারা যেন নিজেদের ভাইদের সেবা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ও তাদেরকে কমপক্ষে এমন আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেন যা কিনা মানসিক অশান্তির কারণ না হয়। আসলে আমাদের ওপরে দরবেশগণের এটা অনুগ্রহ যে, বিরাট কুরবানী করে তাঁরা কাদিয়ানে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং এ সাহায্য কখনও সদকা ও ভিক্ষার রঙ্গে হওয়া উচিত নয় বরং ইহা প্রীতি-উপহার সদৃশ যা কিনা কৃতজ্ঞতা ও মর্যাদার রঙ্গে আমরা বা ভারতের বন্ধুরা দরবেশগণের সেবায় উপস্থাপন করে থাকি।

এভাবে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৯ সনের ১৩ই আগষ্ট এ চাঁদার প্রসঙ্গে জামাতেরা প্রাচুর্যশালী বন্ধুগণের নামে এক বাণীতে বলেনঃ

"জামাতের প্রাচুর্যশালী পুণ্যবান বন্ধুগণ!

আপনারা আপনাদের জীবিকার মাধ্যম নির্বাচন করতে স্বাধীন। খোদার আশিসে চতুর্দিকে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। খোদাতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ও তাঁর দেয়া সৌভাগ্য দ্বারা আপনারা আপনাদের ও আপনাদের পরিবারবর্গের দিনাতিপাতের জন্য সম্ভাব্য মাধ্যম অবলম্বন করে থাকেন। আল্লাহ্তাআলা আপনাদের ধন-সম্পদকে কল্যাণমন্ডিত করে থাকেন। যার কারণে আপনারা ও আপনাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে খোদার আশিসে সাধারণতঃ কোন কষ্ট হয় না।

কিন্তু এমন কতক বন্ধুও আছেন যাঁরা একটি পবিত্র দায়িত্ব পালনার্থে পার্থিব জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কাদিয়ানের দরবেশগণ নিজেদের জীবিকার মাধ্যম বাছাই করার ব্যাপারে আপনাদের মত স্বাধীন নন। তাদের কর্মক্ষেত্র কাদিয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাবদ্ধ। সেখানে তারা নিজেদের জন্যে নয় বরং সমগ্র জামাতের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমাদের প্রাণ তাদের ভালবাসা ও সম্মানের আবেগসমূহে ভরপুর। আমরা তাদের গুণগ্রাহী যে, তাঁরা আমাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করেছেন আর পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁদের জীবিকা অর্জনের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের প্রয়োজনগুলো আমাদের মতই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আবেগ নিয়ে আমাদের উচিত তাঁদের প্রয়োজনের দিকটাকে নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে যেন অগ্রাধিকার দেই। আর তাদের প্রয়োজনগুলোকে পূর্ণ করার জন্যে ভিক্ষা হিসেবে নয় বরং মর্যাদা ও ভালবাসার আবেগ নিয়ে তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করি যেন তাঁরা দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা ব্যতিরেকে জামাতের কেন্দ্রে 'শাআরুল্লাহ্' [আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয় এমন চিহ্নসমূহকে]-এর রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব আদায়ে রাত-দিন নিরত থাকতে পারেন। আল্লাহ্তাআলা আপনাদের ধন-সম্পদে অধিক কল্যাণ দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্তাআলা।

স্বাক্ষর ঃ মির্যা নাসের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

ফযলে উমর ফাউন্ডেশন

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯৬৫ সনের ৭-৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী রাত্রে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিশাল কর্মময়

জীবনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ২১শে ডিসেম্বর তারিখ 'ফযলে উমর ফাউন্ডেশন' নামে একটি তাহরীক করেন আর জামাতকে ২৫ লক্ষ টাকার একটি ফান্ড গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

"ফযলে উমর ফাউন্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)-এর জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আর এ প্রীতি এ জন্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-কে জামাতের প্রতি সমষ্টিগত ভাবে ও লক্ষ লক্ষ আহমদীদের প্রতি ব্যক্তিগত-ভাবে অগণিত উপকার ও ইহসান করার সৌভাগ্য প্রদান করেছিলেন। অতএব খোদাতাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ও যে ভালবাসা ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্যে আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই ভালবাসার চিহ্ন-স্বরূপ আমরা ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করেছি।"

জামাত লাব্বায়েক বলে যুগ-খলীফার ডাকে সারা দিয়ে এ মহান ফাউন্ডেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমাদেরও এতে সামান্য অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আল্লাহ্‌তাআলা দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এ তাহরীকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

নুসরৎ জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ড

মানব জাতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবা ব্যতিরেকে ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের অভিযান দ্রুত সার্বিকভাবে সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই আফ্রিকা মহাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠিকে ইসলামের তবলীগ পৌছানোর সাথে সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী সেবা পৌছানোর কাজকে আরও সুসামঞ্জস ও বেগবান করার লক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) পশ্চিম আফ্রিকা সফর শেষে ২৪শে মে, ১৯৭০ তারিখ লন্ডনের মসজিদে ফযলে 'নুসরৎ জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ড' নামে একটি কল্যাণময় আর্থিক কুরবানীর ঘোষণা দেন। তিনি বলেন ঃ

"গেম্বিয়াতে একদিন আল্লাহ্‌তাআলা খুবই দৃঢ়-ভাবে আমার প্রাণে এ কথা জাগ্রত করেন যে, এখন সময় এসেছে। তোমরা কমপক্ষে এক লক্ষ পাউন্ড এসব দেশে ব্যয় করো ..... এতে আল্লাহ্‌তাআলা খুবই কল্যাণ বর্ষিত করবেন। এবং উত্তম ফলাফল বের করবেন" (আল্ ফযল, ১৫-৭-১৯৭০)।

নিষ্ঠাবান জামাত নিজেদের প্রিয় ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে এ তাহ্‌রীকে বেশী বেশী করে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নেন। এর ফলে "লিপ ফরওয়ার্ড প্রোগ্রাম"এর মাধ্যমে পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে ডজনেরও অধিক নতুন মেডিক্যাল সেন্টার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ফলে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তবলীগের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

এখন আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর এ কল্যাণমন্ডিত তাহ্‌রীককে সম্মুখে অগ্রসর করার লক্ষ্যে 'নুসরৎ জাহাঁ স্কীম নও'-নামে প্রত্যেক বিভাগে দক্ষতা বিশিষ্ট জামাতের ব্যক্তিবর্গকে পশ্চিম আফ্রিকায় তাদের সেবা প্রদানের জন্যে উৎসর্গের তাহ্‌রীক করেন। তিনি তাঁর (আইঃ) পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রাক্কালে গেম্বিয়াতে এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করতে গিয়ে বলেনঃ

"পূর্বে যে তাহ্‌রীক চলছিলো এতে নাম উৎসর্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রয়োজন আর তেমনিভাবে সুদক্ষ ডাক্তারেরও প্রয়োজন। সেবার চাহিদা বাড়ছে ক্রমাগত। এজন্যে এই গোটা বিষয় আমি নুসরৎ জাহাঁ স্কীম নও-এর ঘোষণা করছি" (খুতবা জুমুআ, ২২-১-১৯৮৮, সাবা গেম্বিয়া)।

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এ প্রোগ্রামের অধীন বাংলাদেশ থেকেও আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের ওয়াকফ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা হলেন ঃ ডঃ আব্দুল বাতেন (কর্ম শেষে বর্তমানে কানাডায় অবস্থানরত) ডাঃ আব্দুল্লাহ্ আল্ মামুন (কর্ম শেষে দেশে ফিরে হজ্জ করার সময় মদীনায় ইন্তেকাল করেন)। প্রিন্সিপাল মুসলেহ্ উদ্দিন খাদেম (কর্মশেষে বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন), ডাঃ গোলাম কবীর ও তাঁর স্ত্রী ডাঃ তামান্না খান (বর্তমানে ঘানায় কর্মরত) ও ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান (বর্তমানে কঙ্গোতে কর্মরত)। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

নতুন কেন্দ্র স্থাপনের তাহরীক

পাকিস্তান সরকারের ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৪ তারিখের নিবর্তনমূলক অডিনেন্স জারীর পরে আহমদী জামাতের তবলীগ, পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার, ইবাদাত ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের ওপরে কঠোর বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ার বিরুদ্ধে মু'মিনসুলভ কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"প্রতিক্রিয়া তো বলে এ কথাকেই যে, ... কোন বিষয় যে দিকে বাধা আরোপ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, আর জীবনের চিহ্ন ইহাই। আল্লাহ্‌র আশিসে আমরা তো জীবন্ত জাতি। এজন্যে খোদার আশিসক্রমে যে দিকে তোমরা বাধা দিবে তাঁর সাহায্যের সাথে সাথে আমরা তো সে দিকেই আগে বাড়বো" (খুতবা, ১৮-৫-১৯৮৪, মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত)।

সুতরাং পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানী আহমদীদের ওপরে জারীকৃত বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এ নতুন ধরনের কঠিন মু'মিন-সুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) যেখানে বিশ্ব-জামাতকে নিজেদের তবলীগী, তরবিয়তি ও প্রচারমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর বেগবান করার নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানীতে দু'টি বিশাল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকল্পে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"বর্তমান পরিস্থিতিতে সব দেশে তো নয় বরং এ দু'টি দেশে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এগুলো হবে সারা ইউরোপের জন্যে (আর) এদের সমষ্টিগত কার্যাদি সম্পন্ন করবে" (প্রাগুক্ত)।

খোদার আশিসে ইউরোপে দু'টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ নিজ পরিধিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দু'টি কেন্দ্র তো সারা বিশ্বের কাজের যোগান দিতে পারবে না তাই সারা বিশ্বে আমাদের আরও কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। সেজন্যে জামাতের বন্ধুগণ সর্বদা এ খাতে চাঁদা দিতে থাকবেন।

কম্পিউটারাইজড টাইপ মেশিন ফান্ড

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতী দৈনন্দিন প্রচার কাজের চাহিদাকে পুরো করার জন্যে ১২-৭-১৯৮৫ তারিখের জুমুআর খুতবায় একটি নতুন ধরনের কম্পিউটারাইজড টাইপ রাইটার কেনার জন্যে জামাতের নিকট দেড় লক্ষ পাউন্ড জমা করার একটি তাহ্‌রীক করেন।

জামাতের বন্ধুগণ হুযূর (আইঃ)-এর এ কল্যাণময় তাহ্রীকে ওয়াদা লিখান এবং আদায় করতে থাকেন। প্রত্যেক আহমদীর এতে অংশ নেয়া আবশ্যক।

ইসলাম সুরক্ষা ফান্ড

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্যই এই যে, ইসলামের মাহাত্ম্য ও সত্যতার জ্যোতিঃ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। আর এ পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো কেবল খোদাতাআলার আশিসেই দূরীভূত করা যেতে পারে। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাঁর ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ তারিখের জুমুআর খুতবায় হিন্দুস্তানে শুদ্ধি অভিযানের মোকাবেলায় "শুদ্ধি বিরোধী ইসলামী সুরক্ষা" - নামে একটি আর্থিক কুরবানীর ঘোষণা করেন আর সারা বিশ্বের আহমদীদের এ মহান জেহাদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নসীহতপূর্ণ নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"হিন্দুস্তানে আমরা শুদ্ধির বিরুদ্ধে জবাবমূলক কর্মকান্ড আরম্ভ করেছিলাম। আর বর্তমান বিরোধিতামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তারা আমাদেরকে মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করেছে। এর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জবাব এই যে, যেখানে যেখানে মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে এ মুরতাদ করার প্রক্রিয়াকে বাধা দিন। আর নিজেদের ভাইদের শক্তি যোগান। তাদেরকে তাদের ঈমানের ওপরে কর্তৃত্বদানকারীতে পরিণত করুন। সুতরাং এটা হলো তৃতীয় জবাবমূলক সাধারণ কার্যক্রম। এর মধ্যে সারা বিশ্বের জামাতকে অংশগ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দিচ্ছি। বড় অংশ তো হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কিত। উৎসর্গ-কারীগণকে এগিয়ে আসা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো-এসব বিষয় কেবল হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এ আর্থিক কুরবানীতে সারা বিশ্বের জামাতগুলো অংশ নিতে পারে। এজন্যে আমাদের এদিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে তার সারাংশ এই যে, ইতঃপূর্বে হিন্দুস্তানের বড় বড় ইসলামী দল যারা শুদ্ধি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলো এবং তাদের পেছনে কতিপয় সরকারী অর্থও ছিলো আর বড় বড় ব্যবসায়ীরা অর্থও ছিলো অথচ তাদের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হতে পারে নি। যখন থেকে আহমদী জামাত এক্ষেত্রে প্রবেশ করলো আল্লাহ্তাআলার আশিসে অসাধারণ প্রভাব পরিলক্ষিত হতে লাগলো।

হুযূর (আইঃ)-এ নির্দেশ থেকে এই তাহরীকের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট। জামাতের কর্ম-কর্তাদের নিকট আবেদন তারা যেন জামাতের বন্ধুগণকে এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করানোর জন্যে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

বহির্দেশে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পুনর্নির্মাণ ঃ

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৭ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরের জুমুআর খুতবায় আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে জারীকৃত আন্তর্জাতিক চক্রের বিরোধিতার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও এর তুলনায় খোদাতাআলার পক্ষ থেকে বর্ষিত অগণিত আশিস ও কল্যাণের বারিধারা এবং আহমদী জামাতের মহান উন্নতির উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"বিরুদ্ধবাদীদের দিক থেকে দুঃখ দেবার যে রকম উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে এর যথোপযুক্ত জবাবমূলক কার্যক্রম হিসেবে ঐরকমই পুণ্য কর্মকান্ড আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি মসজিদ ভাঙ্গা বা বিনষ্ট করা হয় তাহলে মসজিদ বানানো আবশ্যক।"

এ প্রসঙ্গে হুযূর বন্ধুগণের সম্মুখে 'বহির্দেশে মসজিদ প্রতিষ্ঠা পুনর্নির্মাণ' নামে একটি আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

"আমাদেরকে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সারা বিশ্বে দু'টি পন্থায় নিজেদের কতক পুণ্যকর্মকে বিশেষভাবে সম্মুখে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। যেখানে যেখানে মসজিদ নেই অথচ জামাত আছে-ছোটই হোকনা কেন- সেখানে মসজিদ তৈরী হওয়া আবশ্যক। আর আল্লাহ্তাআলার আশিসে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে বিগত কয়েক মাসে খোদার আশিসক্রমে জামাতের মসজিদের প্রতি অসাধারণ দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু মসজিদের ওপরে বিশেষভাবে আক্রমণও হচ্ছে এজন্যে আমাদের আরও ক্ষিপ্রতার সাথে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করা দরকার। যদি বড় মসজিদ নির্মাণ করা না-ও যায় তাহলে খড়-কুটো দিয়ে হলেও মসজিদ নির্মাণ করুন। কিন্তু মসজিদের সংখ্যায় অসাধারণভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটানো আবশ্যক। আমি আমার পক্ষ থেকে এসব মসজিদ নির্মাণের জন্যে, যেগুলোর ওপরে শত্রুরা কঠোর আক্রমণ করছে এক হাজার পাউন্ডের ওয়াদা করছি" (বদর, ২২-১১-১৯৮৭)।

হুযূর (আইঃ)-এর এ নির্দেশের বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আহমদী জামাত বর্তমানে যে পরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করছে এর মোকাবেলায় জামাতকে পুণ্যসমূহের ক্ষেত্রে নিজেদের পদক্ষেপ ক্ষিপ্রতর করা উচিত। মসজিদ নির্মাণ ও ব্যাপকতা দানও ইসলামের বিশ্ব-বিজয়কে নিকটে নিয়ে আসার একটি মহান প্রচেষ্টা বিশেষ।

বিশেষ তাহরীকসমূহ

জামাতের কতকগুলো বিশেষ প্রয়োজনে সময় সময় বিশেষ চাঁদারও প্রয়োজন দেখা দেয়। এর পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ কল্পে সদর আঞ্জুমান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবে। আর যখনই কোন বিশেষ চাঁদার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন ঐ চাঁদার ব্যাপারে আলাদাভাবে ঘোষণা করা হয়। জামাতের বন্ধুগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে এগিয়ে আসেন। (চলবে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খোদ্দামের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনা-বরিশাল রিজিয়নের ২০০০-২০০১ সালের ১ম মাঠ পর্যায়ের কর্মশালা গত ২৭-০৪-২০০১ তারিখে শুক্রবার বায়তুর রহমান মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব এবাদত হোসেন রতন সাহেবের সভাপতিত্বে এবং ১৯ জন রিজিওনাল, জেলা ও স্থানীয় কায়েদ এবং প্রতিনিধিদের নিয়ে সাড়ে ৫ ঘন্টা ব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, মোহতরম সদর সাহেব দু'বার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কর্মশালার খবরা - খবর নেয়া সহ দিক-নির্দেশনা দেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। খুলনার মোয়াল্লেম জনাব ফরহাদ হোসেন সাহেবও এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

রিজিওনাল কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
খুলনা-বরিশাল-রিজিওন

আমার জীবন

- শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন

(৩য় কিস্তি)

আশ্চর্য স্বর্গীয় লীলা ঃ

কালামে পাকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য অনুযায়ী সত্যিকার ইসলাম কখনই বিভক্ত হতে পারে না। কিন্তু এই সাবধান-বাণীকে অগ্রাহ্য করে ইসলামের তথাকথিত অনুসারীরা ইসলামকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে ফেলেছে, যারা সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। এমনি একটি সম্প্রদায়ের সাথে আমিও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ্ প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করলেন আমাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে সত্যিকার ইসলামের ধারক ও বাহকরূপে গড়ে তুলতে।

আল্লাহ্তাআলার একটা বিশেষ নিয়ম এই যে, প্রতি হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি এক একজন সাধক পুরুষ প্রেরণ করেন। তিনি ধর্ম সংস্কারক হিসাবে আগমন করেন। এই নিয়ম অনুসারেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্ এমন একজন সংস্কারক পাঠালেন যাঁর মাধ্যমে তিনি আহমদীয়া আন্দোলনের বা সত্যিকার ইসলামের প্রবর্তন করলেন।

ইসলামের সত্যিকার রূপের এই পুনর্জাগরণের আলোকে আমাকে উদ্ভাসিত করে তোলার জন্য তিনি আর এক মহান পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনা হলো এই, তিনি আমার দেশ থেকে ১৫শ' মাইলের বেশী দূরের কাদিয়ান থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এবং পাক কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও একনিষ্ঠ পাঠক ও বিশ্লেষক হযরত ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীকে আহমদীয়তের দাবী সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আমার কাছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়তের গূঢ় অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই সময়ে আমি আমার ব্যবসায়ের এক অংশীদার এবং 'আহলে-হাদীস' সম্প্রদায়ের জনৈক ভদ্রলোকের সাথে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। তিনি আমাকে আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বোঝাবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন এবং বেশ কিছুটা প্রভাবান্বিতও করেন। সুতরাং প্রাণপণে আমি হযরত ইরফানীর মতবাদকে রুখতে চাইলাম এবং তাঁর কথায় নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিলাম না। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত না হওয়ায় তিনি প্রস্তাব করলেন, যেহেতু আমি হযরত মির্যা সাহেবের ইসলামী নীতি দর্শন নামক বইটি পড়েছি এবং তাঁর বক্তব্যটুকুও মূলতঃ গ্রহণ করেছি তাই সত্যিকার ইসলামকে বোঝার জন্য তাঁর অন্যান্য বইগুলোও পড়া উচিত। হযরত ইরফানীর এই প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম এবং হযরত মির্যা সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে পড়তে আরম্ভ করলাম।

তবে ওসব পড়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করলাম, যেসব জায়গায় ইসলাম এবং আল্লাহ্র প্রিয় নবীর উল্লেখ আছে সে সব অনুচ্ছেদগুলো খুব ভালো করে পড়লাম। আর যেসব অনুচ্ছেদে যীশূর জন্ম ও আহমদীয়ত সম্পর্কে উল্লেখ আছে সেগুলো পড়লাম গোঁড়া মনোবৃত্তি নিয়ে। অনেকস্থলে কিছু কিছু এড়িয়েও গেলাম। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ওসব বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা আরও সুস্পষ্ট হলো এবং প্রচুর জ্ঞান লাভ করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহমদীয়তের প্রশ্নে আমার মনোভাব অপরিবর্তিতই রয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত হযরত ইরফানী সাহেবকে বিনা সাফল্যেই কাদিয়ানে ফিরে যেতে হল।

আরও এক লীলা ঃ

কিন্তু দয়াময়ের মাহাত্ম্য বোঝা কঠিন। আমি আহমদীয়তের নীতিকে ছাড়লেও আহমদীয়ত আমাকে ছাড়ল না। লীলাময় এই নির্দেশ জারী করেই রাখলেন যে, আমাকে আহমদীয়ত বা একমাত্র সত্যিকার ইসলামকে আলিঙ্গন করতে হবেই। সুতরাং এর জন্য তিনি আরও এক লীলার অবতারণা করলেন।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধানকে (২য় খলীফা) আল্লাহ্তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ দান করলেন যেন তিনি হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা নিজাম বাহাদুরের কাছে আহমদীয়তের নীতি প্রচার করেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি "তোহ্ফাতুল মালুক" বা 'রাজাদের প্রতি উপহার' এই শিরোনামে একখানা গ্রন্থ লেখেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের দু'জন বিশিষ্ট সদস্যের মারফতে গ্রন্থখানা তিনি নিজাম বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিজাম বাহাদুর অসংখ্য ধন্যবাদের সাথে গ্রন্থখানা গ্রহণ করলেন। এর পরে গ্রন্থখানার শত শত কপি হায়দ্রাবাদের জন-সাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়, এবং উক্ত দু'জন বিশিষ্ট আহমদী দীর্ঘ তিন মাস ধরে হায়দ্রাবাদে আহমদীয়ত প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রচারণার ফলেও কেউই তাঁদের মতবাদ গ্রহণ করল না। সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাঁদেরও ফিরে যেতে হলো।

কিন্তু লীলাময়ের বিশেষ করুণা দৃষ্টি ছিল এই অধমের উপর। সুতরাং তাঁর ইংগিতে দ্বিতীয় খলীফা আবার অনুপ্রেরণা অনুভব করলেন এবং অপর দু'জন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও বিজ্ঞ আহমদীকে আবার হায়দ্রাবাদে পাঠালেন। এরা হলেন হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং হযরত হাফিয রওশন আলী সাহেব। এদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের তদানিন্তন এডভোকেট জনাব সৈয়দ বাশারত আহমদ সাহেব এবং হায়দ্রাবাদ জামাতের আমীর সাহেবকে মনোনীত করা হয়।

প্রথমে তাঁরা হায়দ্রাবাদে বক্তৃতা ও প্রচার কার্য আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য গ্রহণ করবার মতো সৌভাগ্য সেখানে কারোই হ'ল না। পরে তারা এলেন সেকেন্দারাবাদে এবং সেখানেও আহমদীয়ত প্রচার করতে লাগলেন। আমিও ধীরে ধীরে তাঁদের বক্তৃতা শুনতে শুরু করলাম। পরে আমাদের আলাদীন বিল্ডিংয়ে বক্তৃতা করার জন্য তাঁদের আমি আমন্ত্রণ করলাম। তার পর থেকে রোজই কুরআনের দরস দিবার জন্য তাঁরা আমার বাড়ীতে আসতেন। পাছে আমি আহমদীয়ত গ্রহণ করে বসি সেই ভয়ে সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায়ের জ্ঞানী মৌলবীরা আমাকে আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বুঝাতে শুরু করলেন। এই অবস্থা প্রায় তিন মাস ধরে চলতে থাকলো। ফলে আমি এই উভয় মতবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তর্কগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করার বেশ সুযোগ পেলাম।

শেষে পরম করুণাময়ের দয়ায় আহমদীয়তের সত্য আমার অন্তর্চক্ষুর সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠলো এবং আমি এর সত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলাম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আহমদীয়ত গ্রহণের সাহস আমার হ'ল না কেননা, আহমদীয়ত গ্রহণ করে বসলে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং বিশেষ করে আমার ব্যবসায় সেই অংশীদার, এরা সবাই পাছে আমার উপর মনক্ষুণ্ন হন, এই ভয় আমার খুব বেশী ছিল। শুধু যে আহমদীয়তই গ্রহণ করি নি তাই নয়, বরং আমার বাড়ীতে দরসে কুরআনও বন্ধ করে দিলাম।

আমার প্রতি কারা শাস্তি ঃ

এমনি করে আহমদীয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরও যখন আমি মনের জোর পাচ্ছিলাম না এবং লোকভয়ে এই মতবাদ গ্রহণ করা থেকে পেছনে হটছিলাম, তখন আল্লাহ্তাআলা আমার জন্য আর এক ভয়াবহ এবং রূঢ় পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। তা'হলো এইঃ

এক রাতে আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলাম, যার কথা ভাবতে এখনও আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। দেখলাম, আমার সেই আহলে হাদীস অংশীদার অপর একজন অপরিচিতের সাথে বসে তৃতীয় কোন একজন সম্পর্কে দুষ্ট আলোচনা করছেন। এমন সময় হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হলো এবং আমাদের তিন জনকেই গ্রেপ্তার করে সেকেন্দারাবাদ কোর্টে পেশ করল। কোর্ট আমাদের আট দিনের কারাবাসের আদেশ দিলেন....। তারপরে দেখলাম, আমি জেলে বসে কাঁদছি আর শুধুই বলছি, বিনা দোষেই আমাকে এই কারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ আমার আহলে হাদীস অংশীদারই শুধু অন্যের সম্বন্ধে দুষ্ট আলোচনা করছিলেন, আমিতো সে আলোচনায় অংশই নিই নি ...।

স্বপ্ন শেষে জেগে ওঠে এই অভাবনীয় ব্যাপারটা আমায় সমগ্র মন, প্রাণ ও চিন্তা অধিকার করে বসলো এবং এই স্বপ্নের তাৎপর্য আবিষ্কারে নিজের সব চেতনা প্রয়োগ করার পরে এর যে অর্থ আমার বোধগম্য হলো তা এইঃ আমি আহমদীয়তের সত্যে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমার আহলে হাদীস অংশীদারের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি না এবং লোকভয়ের দরুন খোলাখুলিভাবে আহমদীয়ত গ্রহণ করছি না। লীলাময় আল্লাহ্তাআলা এই ভয়াবহ স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে একাধারে শাস্তি দিলেন এবং অন্যদিকে সাবধান করে দিলেন। এখনও সাবধান না হ'লে পরে তিনি আমাকে দোযখের শাস্তি দেবেন....।

পরদিনই আমার আহলে হাদীস পার্টনারকে আমার এই ভয়াবহ স্বপ্নের কথা সবিস্তারে খুলে বললাম এবং সাথে সাথে আমার মনোভাবের কথাও তাকে খোলাখুলিভাবে জানালাম। তারপরেই ১৯১৫ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে হায়দ্রাবাদের আহমদীয়া জামাতের আমীরের কাছে আমি আমার পূর্ব-মতবাদ ত্যাগ করে আহমদীয়া মতবাদে দীক্ষা নিলাম। হে সর্বশক্তিমান করুণার আধার! হে খোদা! সমস্ত প্রশংসাই তোমার!

স্বর্গীয় আলোকের সন্ধান প্রাপ্তি ঃ

সাধারণ নিয়মানুসারে উচ্চতর কোন কর্মচারী যদি তার অধীনস্থদের পদোন্নতি করতে চান তাহলে কী ধরনের দরখাস্ত তারা পেশ করবেন তা তিনি নিজেই বলে দেন। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থেই এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এই পদ্ধতির সমর্থন আমরা কুরআনেও পেয়ে থাকি। যেমন, আল্লাহ্ নিজেই আমাদের বলতে শেখাচ্ছেন ঃ

"হে আল্লাহ্ ইহজগতে এবং পরজগতে তুমি আমাদের মঙ্গল সাধন কর এবং আগুনের ধ্বংসলীলা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

পরম দয়াময় আল্লাহ্ আমাকেও বিশেষভাবে আশীর্বাদ করলেন নিম্নলিখিত প্রার্থনা শিক্ষাদানের মাধ্যমে ঃ

"হে আল্লাহ্, যে যে আশ্চর্য কাজ এ মর জগতে কেউ করতে পারে নি, আমাকে শক্তি দাও যেন সে পরম কাজ আমিই করতে পারি-এ কাজ হলো তোমাকে সন্তুষ্ট করা আর তোমার সৃষ্ট জীবদের সেবা করা। একাজ যেন এমনিভাবে করতে সক্ষম হই যাতে আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই আমার উপর পরিতুষ্ট থাকে ও আমার জন্য প্রার্থনা করে এবং ছোট বড় সবাই নিজেদের জন্যও প্রার্থনা করতে যেন না ভুলে।"

কি আশ্চর্য প্রার্থনা! সত্যি, আমি কী এবং কি-ই বা আমার মূল্য! আমার মতো এমন একজন অজ্ঞ লোকের জন্য এরকম একটি প্রার্থনা সত্যিই বিস্ময়কর! এটা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি না সর্বশক্তিমান আমাকে দিয়ে এটা করিয়ে না নিতেন। মহান আল্লাহ্ আমি চাইতেই আমাকে স্বর্গীয় আলোকের সন্ধান দিয়ে মহামান্বিত করেছেন।

আমার উপর দিয়ে যখন এ পরীক্ষা চলছিল তখন এর মূল্যবোধ সম্পর্ক আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম, কারণ এর পূর্ণতা সম্পর্কে কোথাও কোন ইঙ্গিত ঘূণাক্ষরেও আমার চোখে ধরা পড়ে নি। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের খলীফাকে এর ইঙ্গিত প্রদান করলেন, যা তাঁর নিম্নলিখিত চিঠি হতে (১৯২৫ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে খলীফা কর্তৃক আমাকে লিখিত) প্রতীয়মান হয় ঃ

"তুমি আহ্মদীয়ত গ্রহণের পূর্বেই মুফতী মুহাম্মদ সাদিক সাহেব আমার কাছে লিখেছিলেন যে, তুমি আহমদীয়তের প্রতি বিশেষ একটি আকর্ষণ অনুভব করছিলে এবং খুব সম্ভবতঃ অতি শিগ্গীর আমাদের এই মহান আন্দোলনে যোগদান করবে। তখন আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি জমকালো প্রাসাদের বিরাট উন্মুক্ত চত্তরে একটি সিংহাসনের উপর তুমি বসে আছো; এবং অনন্ত ঘননীল অসীম থেকে বৃষ্টির মতো তোমার পরে স্বর্গীয় আশীষধারা বর্ষিত হচ্ছে। তখনই আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তুমি অনতিবিলম্বেই আমাদের আন্দোলনে যোগদান করবে ও আমাদের মধ্যে তোমার উপস্থিতি সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণকর হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে" ...।

অতঃপর ১৯৩৩ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ঃ

"হায়দ্রাবাদে "জামাতে আহমদীয়া" অনেক দিনের প্রতিষ্ঠান ...এবং এতে এমন অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক আছেন যাঁরা অন্যান্য অগ্রগামী জামাতের সাথে তাল মিলিয়ে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ শেঠ আবদুল্লাহ্ আলাদীনের নাম করা যেতে পারে। তিনি এমন লোক তাকে যতই দেখি ততই মনে সন্তুষ্টি আসে। প্রথমতঃ তাঁর আহমদীয়ত প্রচার কার্য দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্পর্কে একটি স্মৃতিকথা ভাবতে আমার বড়ো ভাল লাগে। এটা হলো তাঁর এই আন্দোলনে যোগদানের পূর্বেকার কথা। শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব আমার কাছে লেখেন যে, সেকেন্দারাবাদে একজন শেঠ সাহেব আছেন যিনি আহমদীয়া আন্দোলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক এবং আপনি আল্লাহ্র কাছে এই কামনা করবেন যেন তিনি সত্বর এতে যোগ দেন। আমি আল্লাহ্র নিকট আমার প্রার্থনা জানালাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি এ বিরাট প্রাসাদের প্রশস্ত চত্তরে এক সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং আরও দেখলাম যে, এক উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ফিরিশ্তারা সেখানে অবতীর্ণ হয়ে তার শিরে স্বর্গীয় আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন। স্বপ্নে আমি তার যে চেহারা দেখেছিলাম সে চেহারার সাথে তার বাস্তবের চেহারা হুবহু মিলে আছে। পরে তিনি যখন এই আন্দোলনে যোগদান করেন তখন আমার স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম। আহমদীয়া আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য তিনি তাঁর মূল্যবান সময় এবং অর্থ এমন অকৃপণভাবে ব্যয় করেছেন যে তাঁর সাথে অন্য কাকেও তুলনা করা চলে না।"

আমাকে এমনভাবে মহিমান্বিত করার কথা যদিও আমি জানতাম না, তথাপি দয়াময় খোদা অনেক আগেই এ সম্পর্কে তাঁর খলীফাকে অবগত করান। হে পরম বিশ্বপিতা, সমস্ত প্রশংসাই তোমার। (চলবে)

অনুবাদ - **মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন**

তাহ্‌রীকে ওয়াকফে নও ও আমাদের কর্তব্য

"ওয়াকফে নও" একটি যুগান্তকারী তাহরীক। খলীফাগণ যে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত, আর তাঁদের যে খোদাতাআলাই পথ-নির্দেশনা দান করেন তার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যুগ-খলীফার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তআলার পক্ষ থেকে এই "ওয়াক্‌ফে নও" তাহরীকের প্রবর্তন। বর্তমান সময়ে আহমদীয়া জামাত অতি দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে আর বিজয় ও উন্নতির চরম সোপানে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় জামাতকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা, তথা তা'লীম-তরবিয়তের সুশৃংখল ব্যবস্থার মাধ্যমে জামাতের সকলকে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান করার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য যে মুজহিদ বাহিনী একযোগে খলীফার হাতকে শক্তিশালী করবেন তারাই হলেন আজকের " ওয়াকফে নও" শিশু।

সুধী পাঠক! চলুন তাহ'লে আলোচনা করা যাক এই তাহরীকের অজানা অধ্যায় ঃ "ওয়াক্‌ফে নও" শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নব-উৎসর্গ বা জীবন উৎসর্গের নব দিগন্ত অর্থাৎ নবধারা। নূতন উৎসর্গকারীদের সম্বন্ধে বলার পূর্বে আমাদের কর্তব্য ইতঃপূর্বে ধর্মের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের বেদনা বিধুর কিঞ্চিৎ ইতিহাস অবহিত হওয়া।

পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা কাল থেকেই একটি সম্মানিত শ্রেণী মহান খোদার অভিপ্রায়কে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে নিজ প্রাণ বিসর্জনকারী ছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। একটি সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম। বৃদ্ধ বয়সে তাকে পেয়েও খোদার নির্দেশে নিজের সকল ভালবাসা ও আবেগকে দমন করে মক্কার জনবসতিশূন্য এলাকায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ছেলে কৈশোর উপনীত হওয়ার পর বার বার যখন আল্লাহ্ হতে নির্দেশ আসতে লাগলো তখন আবারো জবাই করার জন্য স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। এমনিভাবে বনী ইস্রাইল জাতির মাঝে কোন না কোনভাবে এই উৎসর্গ করার নিয়ম দীর্ঘকাল প্রবহমান ছিল। তারা তাদের প্রথম সন্তানকে ধর্মের সেবায় নিবেদন করত বলে বাইবেলে পাওয়া যায়। বনী ইস্রাঈলী এই ব্যবস্থার কথা মহান আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ঃ সূরাতু আলে ইমরানের ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"(সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি মুক্ত করে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম, সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে উহা গ্রহণ কর"।

এভাবেই হযরত মরিয়মকে তাঁর মা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়কফ্ বা উৎসর্গ করেন।

এতো গেলো বনী ইস্রাঈলদের কথা। কিন্তু আরবে বসবাসকারী বনী ইসমাঈলীদের সাথেও খোদার পথে সন্তান উৎসর্গ করার রীতি বিদ্যমান ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড)।

প্রিয়নবী মহানবী আঁ হযরত (সঃ)-এর আগমনের ফলশ্রুতিতে এই প্রথাটি আরো ব্যাপকতা লাভ করে দৃঢ়ভাবে। ধর্মের প্রচার ও এর সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহানবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা (রাঃ) আত্মত্যাগে কোন শৈথিল্য দেখান নি বরং পূর্বের যুগের তুলনায় তারা ত্যাগের ময়দানে ধর্মের খাতিরে যথেষ্ট সংযম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালনার্থে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবারা (রাঃ) পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন এবং আমরণ ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন যেমন, খলীফাগণ (রাঃ), হযরত মুসায়েব বিন উমায়ের (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়ের সহ আরো অন্যান্য সাহাবীদের নাম বিশেষভাবে দোয়ার সাথে স্মরণযোগ্য। হযরত আকদস মুহাম্মদ (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবে এ ধারায় আরো গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ১৯০৪ সনে হযরত মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রাঃ)-এর ন্যায় ক্ষণজন্মা আলেমের মৃত্যুতে হযরত (আঃ) দারুণভাবে মর্মাহত হন এবং জামাতের সামনে অত্যন্ত হৃদয় বিগলিত বেদনাঘন বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন, হে আমার জামাতের সম্মানিত সদস্যগণ! আমাদের এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যার ফলশ্রুতিতে এমন আলেমদের সৃষ্টি হবে যারা মৃত আলেমদের স্থলাভিসিক্ত হবেন। হুযূর (আঃ)-এর এমন আবেগপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণে সেদিন অনেকেই নিজেদেরকে জামাতের সেবার উদ্দেশ্যে পেশ করেন আর তা ফলশ্রুতিতে কাদিয়ানে মাদ্রাসায়ে আহমদীয়া নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। এর অধীনে শত শত নিবেদিত প্রাণ আহমদী পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এই শিক্ষা বা নসীহত রেখে গেছেন যে, মহান খোদার অভিপ্রায় এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি নিজেদের ধন-সম্পদ সম্মান এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তা করতে তোমরা কখনও কুণ্ঠাবোধ ক'র না। জামাতে আহমদীয়ার প্রথম খলীফা আলহাজ্জ হযরত মওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ) নিজেও যুগ-ইমামের আহ্বানে পৃথিবীর সমস্ত আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে ইসলামের সেবায় নিজেকে পেশ করেছিলেন এবং আমৃত্যু একজন খাঁটি ইসলাম-সেবী হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। তার তিরোধানের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জামাতের সার্বিক উন্নতি হয়। আর তাঁর বিচক্ষণতায় এ জীবন উৎসর্গী-করণ ব্যবস্থাটি আরো সুদৃঢ় হয়। পৃথিবীতে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর শান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার নিমিত্তে জামাতে আহমদীয়া অনেক উচ্চ পর্যায়ের আলেম সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৩৪ সনে জামাত যখন বিরুদ্ধবাদীদের হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল তখন এই অপশক্তির মোবাবেলার জন্য প্রকৃত ইসলাম বা আহমদীয়তকে প্রতিষ্ঠার জন্য মর্মস্পর্শী আহ্বান জানান তখন সকল স্তরের মানুষ তাদের জাগতিক সকল কাজকে তুচ্ছ করে যুগ-খলীফার ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করে কেবল দু' একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। হযরত মওলানা শের আলী সাহেব (রাঃ) ছিলেন একজন সেসন জজ। খলীফার ডাক শুনে সাথে সাথে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে খলীফার হাতে নিজেকে পেশ করেন। অনুরূপভাবে হযরত মওলানা সরওয়ার শাহ্ সাহেব ছিলেন Edward college এর প্রফেসর। তিনিও যুগ-খলীফার আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি বরং নিজেকে পেশ করে চলে এলেন কাদিয়ানে ইসলাম সেবার মানসে। এঁদেরই দ্বারা ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশে ইসলামের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

আজও হচ্ছে আর হবে কেয়ামত অবধি। এ ধারাবাহিকতায় মানব সেবার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে আহমদী ডাক্তারগণ। তারা আফ্রিকার রুগ্ন জনবসতির সেবায় সর্বদা উৎসর্গীকৃত হয়েছেন আর অসংখ্য শিক্ষকও আফ্রিকা সহ সারা পৃথিবীকে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন অবহেলিতদের মাঝে যাঁদের ত্যাগ আর সেবার অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর মানুষ কখনই ভুলবে না। তাঁদের জন্য আমাদের দোয়া করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্ যেন তাঁদের প্রতি পদক্ষেপে বরকতের রূহ ফুৎকার করেন।

সুপ্রিয় পাঠক! এবার তাহলে আসা যাক প্রবন্ধের মূল অংশে। আপনারা জানেন, পৃথিবীর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মানবজাতির ক্রমবর্ধমান সমস্যা, বঞ্চিত মানবতার করুণ ক্রন্দন, অবক্ষয়ের কড়াল গ্রাস, রাজনীতির নোংরা ব্যবহার, অজ্ঞতা ও খোদাহীনতার বেড়াজাল থেকে আর্ত-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে জামাতে আহমদীয়ার প্রিয় ইমাম যুগ-খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৭ সনে ওয়াক্ফের জগতে একটি নব দিগন্তের সূচনা করেন এবং উহার নামকরণ করেন **"ওয়াক্ফে নও"** এই বাবরকত তাহরীকের ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি (আইঃ) বলেন ঃ -

খোদাতাআলা আমার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যেন আমি জামাতের নিকট এই তাহরীক করি, তারা যেন ওয়াদা করেন যে, আগামী দু'বছরে তাদের যদি সন্তান লাভের সৌভাগ্য হয় তাহলে তাকে তারা খোদার সমীপে পেশ করবে। যে সকল মা এখন সন্তান সম্ভবা আছেন তারাও যেন ওয়াদা করেন। কিন্তু ওয়াদা হ'তে হবে পিতা মাতার সম্মিলিত। উভয়কে একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন পরবর্তীতে এ বিষয়ে মতভেদ না হয়। শিশু কাল থেকেই যেন তার (সন্তানের) উত্তম চরিত্র গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। কেননা, যে এক মহান উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জন্ম নিয়েছে ইহা সেই সময় যখন ইসলামের বিজয়ের এক শতাব্দী অন্য শতাব্দীর সাথে সন্নিবেশিত। পিতা-মাতাগণ সন্তানকে একথা বার বার বলবেন যে, এ যুগ-সন্ধিক্ষণে তুমি জন্ম নিয়েছ। পবিত্র নিয়্যত ও দোয়ার সাথে আমরা তোমাকে চেয়েছিলাম এবং এ দোয়া করেছিলাম যে, হে খোদা! আগত প্রজন্মের তরবিয়তের জন্য তাকে মুজাহিদ বানিয়ে দাও, এ দোয়া অব্যাহত রেখে যদি এ দু' বছরে নবজাত সন্তানদের ওয়াক্ফ করা হয় তাহলে দেখতে দেখতে এক অতি উত্তম এবং প্রিয় প্রজন্ম আমাদের সামনেই খোদার রাস্তায় কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে (খুৎবা জুমুআ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৭)।

এ স্কীম ঘোষণার পর হুযূর (আইঃ) ওয়াকফীনে নও শিশুদের তদারকী ও সঠিক পরিচর্যার জন্য তাহরীকে জাদীদের অধীনে একটি ওকালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই দপ্তর সর্বদাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই তাহরীকে দুই বছরে পাঁচ হাজার মুজাহিদের আবেদন পেশ করলেও পরবর্তীতে জামাতের বন্ধুদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের প্রেক্ষিতে হুযূর (আইঃ) "ওয়াক্ফে নও" স্কীমে অংশ গ্রহণের তাহরীককে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। এই পবিত্র তাহ্রীক আর আমাদের দায়িত্ব কি তা ওকালতে "ওয়াক্ফে নও" কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যাবলী হ'তে সংক্ষেপে তুলে ধরছি ১। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মসনুন দোয়া ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর অত্যন্ত সহযোগিতা ও পরস্পরের মাঝে সুন্দর ভালবাসার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, তা না হলে শিশু অপরিপূর্ণ থেকে যাবে।

২। কেবল স্বামী-স্ত্রীই নয় বরং প্রসব-পূর্বাবস্থায় পরিবারের সকলকেই এই নেক কাজে অংশ নেয়া কর্তব্য। আর মাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

৩। রীতিমত মেডিকেল চেকআপ হওয়া একান্ত আবশ্যক, সাথে সাথে উপযুক্ত মাত্রায় খাদ্য ও ভিটামিন সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪। মাকে এমন ক্যাসেট বা বই সরবরাহ করা উচিত যদ্বারা জন্মের পূর্বেই শিশুর তরবিয়ত আরম্ভ হয়। কুরআন করীম উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা উচিত কারণ এমন প্রমাণও আছে যে, মাতৃ-গর্ভে থাকা কালীনই শিশু অনেক কিছু শিখতে পারে।

৫। হুযূর (আইঃ)-এর পথ-নির্দেশনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে মাকে নিজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে না হয় শিশুর উত্তম তরবিয়ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। মায়ের কক্ষে Television set রাখা একান্তই অনুচিত।

৬। মায়ের কক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও খলীফাগণের ছবি রাখা উচিত। এতদ্দ্বারা মা ও সন্তান উভয়ের উপর গভীর রেখাপাত করতে পারে।

পিতা-মাতার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর দিক নির্দেশনাঃ

হুযূর (আইঃ) এই তাহরীকের প্রারম্ভ থেকেই তার কয়েকটি খুতবায় "ওয়াক্ফে নও" শিশুদের পিতা-মাতার কর্তব্য সম্বন্ধেও ব্যাপক নির্দেশনা দিয়েছেন নীচে সংক্ষেপে কিছু উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ

ক। পিতা-মাতা যেন ওয়াকেফীনদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে তা সত্ত্বেও যদি আমরা তাদের তরবিয়তের ব্যাপারে অবহেলা দেখাই তাহলে খোদার দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবো। হঠাৎ করে কেউ নষ্ট হয় না। তাই তাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বড় হলে পিতা-মাতা যদি মনে করেন যে, তার সন্তান ওয়াকফের যোগ্য নয় তাহলে তারা যেন অবশ্যই বিশ্বস্ততা ও খোদা-ভীতির সাথে তা জামাতকে অবহিত করেন।

খ। শিশুদের ভিতর অনিন্দ্য-সুন্দর চরিত্র গঠন করতে হবে, শৈশব কাল হতে সত্য-প্রিয়তা আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। মাতৃ দুধের সাথে এই সুন্দর গুণ মিশ্রিত হওয়া দরকার। বিকিরণের মত এ গুণাবলী তাদের স্বভাবের মধ্যে প্রোথিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে পূর্বের তুলনায় অধিক সত্যবাদী এবং নিজেদের তরবিয়তের প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক সাবধানে কথা-বার্তা বলতে হবে। ঠাট্টাচ্ছলেও যেন মিথ্যা বলা না হয় কারণ তাদের ঘরে খোদার আমানত লালিত-পালিত হচ্ছে।

এর পাশাপাশি "ওয়াকফে নও" মুজহিদের মাঝে স্বল্পে-তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সর্বদা লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সততা ও বিশ্বস্ততার শিক্ষা দিতে হবে। ওয়াক্ফ এবং বদমেজাজ একসাথে চলতে পারে না। ইহা সর্বদাই ফেতনা ও সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়। তাই ছোট বয়স থেকেই সহনশীলতার অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। আনন্দ ও বিনোদনের জন্য তাদেরকে শিক্ষনীয় গল্পের বই-পুস্তক পড়ানো ও মজার Jokes (চুটকি) শুনানো যেতে পারে। আর গরীবের দুঃখ-কষ্টের প্রতি যেন উদাসীন না হয় তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

গ। "ওয়াক্‌ফে নও" মুজাহিদকে ছোট বয়স থেকেই সুশৃংখল আচার-আচরণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হুযূর (আইঃ) বলেছেনঃ আমাদের এমন শিশুর প্রয়োজন যারা নিজেদের ক্রোধ দমন করতে পারে। যাদের জ্ঞান তার তুলনায় কম তাদরেকেও তুচ্ছ ভাববে না। বিরোধিতামূলক কথা শুনে সহনশীলতার পরিচয় দিবে। চিন্তা করে যেন জবাব দিতে অভ্যস্ত হয়। এ সকল অভ্যাস ছোট কাল থেকেই শিখাতে হবে। কোন বিষয়ে যতটুক জানা আছে বলার সময় যেন ততটুকুই বলে। অনুমান বা ধারণাকে যেন এর সাথে মিশ্রিত না করে। ধারণাকে ধারণার স্থানেই যেন রাখে। নতুবা মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ক্রমান্বয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে থাকে।

ঘ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের শিক্ষা দিতে হবে। টাইপ শিখাতে হবে, হিসাব রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। সততার উপর জোর দিতে হবে। যদি টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে দুর্বলতা থাকে তাহলে একসময় উহা চরম বিপর্যয় বয়ে আনবে। যদি জামাতের ওহদাদারগণ (কর্মকর্তারা) অসৎ হয় তাহলে যারা চাঁদা দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে তাদের এ সৌভাগ্যকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। অতএব তাদেরকে ছোট বয়স থেকেই হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে তরবিয়ত প্রদান করতে হবে। গণিতের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

এরপরে হুযূর (আইঃ) বলেছেন ঃ হোঁচট থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা বা পদ্ধতি শিখাতে হবে। কঠোর পরিশ্রমী হ'তে হবে। শৈশব থেকেই জামাতী অংগ-সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত থাকলে বড় সুন্দর তরবিয়ত লাভ হবে। খোদ্দামের সীমায় (যৌবন প্রাপ্তি কালে) তরবিয়ত হলে আর বিপথগামিতার সম্ভাবনা থাকে না। পিতা-মাতা কখনই নিজ গৃহে জামাতের নেযামকে খাট করে কোন আলোচনা করবেন না। আপনি কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে হয়ত বেঁচে যাবেন কিন্তু আপনার কচিমনের অধিকারী শিশু অবশ্যই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন আবার ঃ "ওয়াক্‌ফে নও" মুজাহিদকে মহান নেতৃত্বের যোগ্য ক'রে গড়ে তুলুন। ভালো নেতার ভিতর পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শক্তি থাকে। ধৈর্যের সাথে কষ্ট সহ্য করে নির্যাতিত হয়েও অভিযোগ করে না কারণ অভিযোগে অন্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব আমি পিতা-মাতাকে বলবো যে, এ কথাগুলো সামনে রেখে আপনার শিশুকে যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলুন।

বিশ্বস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করুন ঃ

ওয়াকফে জিন্দেগীর বিশ্বস্ততার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে। জীবনের যে কোন সময় যে ওয়াক্‌ফ ছেড়ে দেয় সে নিজ আত্মার উপর বিশ্বাসঘাতকতার কলংক লেপন করে। ইহা অনেক বড় কলংক। ওয়াক্‌ফ করার ফলে হয় আপনার শিশু অনেক বড় অলিউল্লাহ্ হবে নতুবা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা আছে। কোন কোন ছেলে খামখেয়ালীপনা বা চালাকীতে অভ্যস্ত হয়। এটি জামাতের জন্য আর তার নিজের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়। শিশুদের বুঝানো উচিত, আমরা খোদার সাথে আন্তরিকভাবে ওয়াদা করেছি! কিন্তু তুমি যদি এর গুরুত্ব না বুঝ তাহলে ফিরে যেতে পারো। যখন শিশু যৌবনে উপনীত হবে তখন জামাত পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করবে এখন পূনরায় সিদ্ধান্ত ঝালাই কর।

শিশুকে তাকওয়ার অলংকারে সজ্জিত করুন ঃ

কুরবানীর একটি বকরীকে যেমন মানুষ জবাই করার পূর্বে অতি আন্তরিকতার সাথে সাজায় অনুরূপভাবে আপনার ওয়াক্‌ফকৃত সন্তানকে তাকওয়া দ্বারা সজ্জিত করুন, এজন্য বাল্যকাল থেকে তাদেরকে মুত্তাকী ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার শিক্ষা দিন। তাদের সামনে এমন কাজ করা উচিত নয় যদ্বারা তারা ধর্ম হ'তে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আপনি যদি শৈশব কাল হ'তে শিশুকে খোদার ক্রোড়ে দিয়ে দেন তাহলে স্বয়ং খোদাই তাকে সামলাবেন।

পিতা-মাতা নিজেদের চাল-চলনে পবিত্রতা রক্ষা করুন ঃ

কেবল মৌখিক তরবিয়তে কাজ হয় না। তাই নিজেদের চাল-চলনে এতটা পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন যেন আপনার এই পরিবর্তন আগামী প্রজন্মের সংশোধন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সারস্বরূপ হয়।

হুযূর (আইঃ) "ওয়াক্‌ফে নও" শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে আরও বলেন ঃ

প্রথম থেকেই (বাল্যকাল) গাম্ভীর্যের সাথে কুরআন শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নেযামের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তিলাওয়াতের সাথে সাথে যেন অর্থ বুঝার চেষ্টা করে, অনুবাদ যেন অবশ্যই শিখে। নামাযের পাবন্দী শিশুকাল থেকেই করতে হবে।

শিক্ষার পরিধি ব্যাপক হতে হবেঃ

সাধারণতঃ যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু এ গন্ডির বাইরে যারা থাকে তারা ধর্মীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। ইহা ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ। তাই প্রথমে দুনিয়া সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যাপকতার প্রয়োজন পরবর্তীতে এর সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে হবে। পিতা-মাতা শিশুদের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং তাদের জন্য উত্তম পত্র-পত্রিকা আর পুস্তকাদির ব্যবস্থা করুন, পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বিজ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ছাড়াও, জীবন-পদ্ধতি, অর্থনীতি, দর্শন মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া পাঠ্য বইয়ের বাইরেও পাঠ্যাভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

ভাষা শিক্ষা দানের ব্যাপারে হুযূর (আইঃ)-এর নসীহত ঃ

মাতৃভাষা অবশ্যই ভালভাবে জানতে হবে এছাড়া উর্দূ ও আরবী ভাষা জানা আবশ্যকীয়। যে সকল ভাষায় আমাদের কমৃতি আছে তার মধ্যে রুশ ও চীনা ভাষা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। ফ্রেন্স আর স্পেনিশ ভাষা শিখারও প্রয়োজন আছে। যদি দোলনায় থাকা অবস্থায় ভাষা শিখানো যায় তাহলে তা অতি উত্তম। যারা নার্স রেখে শিখানোর সামর্থ্য রাখেন তারা অবশ্যই নার্স নিযুক্ত করুন। বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী প্রচারে আমাদের সর্ব প্রকারের ভাষা-ভাষীর প্রয়োজন।

মেয়েদের শিক্ষা প্রসংগে হুযূর (আইঃ) বলেছেন ঃ

মেয়েদের বেলায় সেই সকল সুযোগ নেই যা ছেলেদের বেলায় আছে। তাদেরকে যত্রতত্র পাঠানো যায় না। হেফাযতের প্রশ্ন আছে তাই আমি বলছিলাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে আসা হোক, শিক্ষা দেয়ার কৌশল শিখানো হোক, অর্থাৎ তাদেরকে বি,এড করাতে হবে। মহিলা ডাক্তার বিরাট খেদমত করতে পারে তাই তাদেরকে ডাক্তারীও পড়ানো উচিত। এতদ্দ্বারা তারা জামাতের অনেক বড় সেবা করতে পারবে। মেয়েদেরকে ভাষাও শিখানো উচিত কেননা ঘরে বসে তাদেরকে সাহিত্য রচনা করতে হবে। এছাড়া টাইপ শিখানোও জরুরী। আর ভালো ঘর-কন্যার কাজও শিখতে হবে।

পরিশেষে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, "তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও" এমন একটি পরিকল্পনা যা স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁর খলীফার অন্তরে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইহা এমন একটি Programme যার সুদূর প্রসারী প্রভাব ও কল্যাণ রয়েছে। শত শত বছর ধরে মানুষ এই স্রোতস্বিণী থেকে সুশীতল আধ্যাত্মিক বারি পান করবে। এটি এমন একটি অনন্য কার্যক্রম, খোদার কৃপায় পৃথিবীর অন্য কোন সংগঠন এ ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়ার সমকক্ষ নয়। পৃথিবীর অনেকেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কথা বলে, দুনিয়ার সামনে Programme-ও দেয়; কিন্তু জন্মের পূর্বেই মায়ের কোল থেকে সন্তানকে নিয়ে নেয়ার বা সন্তান দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কেউ এ জামাতের সমান্তরালে দাঁড়াতে পারবে না। একাজ শুধু তারাই পারে যারা এক পবিত্র সত্তায় বিশ্বাসী এবং যারা মানব জাতির কল্যাণের জন্যে হৃদয়ে দরদ রাখে।

এই প্রজন্ম পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করবে, মিথ্যা, অন্যায়-অবিচার আর অবক্ষয়ের প্রবল স্রোতকে দৃঢ়ভাবে রুখে দিবে। পৃথিবীর বঞ্চিত, শোষিত মানুষের জন্য তারা বয়ে আনবে শুভ সংবাদ। বর্ণ বৈষম্যকে তারা পৃথিবী থেকে কান ধরে বিদায় দেবে। কেননা, এর কারণেও আজ আল্লাহ্‌র যমীনে রক্তপাত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ (আঃ) যেমন তাঁর পবিত্র হাতের ছোঁয়ায় ক্লান্ত ও শ্রান্ত বনী ইস্রাঈলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পাপ হ'তে তাদেরকে পূণ্যের পথে নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে হাজার হাজার "ওয়াকেফীনে নও" মরিয়মী গুণে গুণান্বিত হওয়ার পর অন্যায় ও ব্যভিচারে ভরা এই দুনিয়াতে challange হিসাবে আত্ম প্রকাশ করবেন। আমার এ বাক্যগুলো কাল্পনিক কিছু নয়। কেননা সূরা তাহরীমের শেষ আয়াতগুলোতে ঠিক এ বিষয়টি আল্লাহ্‌তাআলা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা এই উম্মতের মু'মিনদের মরিয়মের সাথে সাদৃশ্যরূপে বর্ণনা করেছেন। যারা পৃথিবীকে ঈসা (আঃ)-এর মত মহাবিপ্লব আনয়নকারী ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছেন। হাজার হাজার "ওয়াকেফীনে নও" ঈসায়ী রূপ ধারণ করবেন এবং পৃথিবী পাপ মোচন করবেন। আর এসব কোন কল্পনা-প্রসূত কথা নয়। ইসলাম এবং আহমদীয়তে ঘোরতর শত্রুরাও জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে যে পৃথিবীতে একটি বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে সে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয় নি।

পরিশেষে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবির একটি উদ্ধিতি আপনাদের সামনে রাখছি ঃ -

"পৃথিবীতে যেই পরিবর্তন আসে তা চারিত্রিক শক্তির কারণেই সাধিত হয়। যে মনে করে বৃহৎ শক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন আসে সে ভ্রান্তির মধ্যে আছে। আজ খৃষ্ট ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম মুখোমুখী। মুসলমানদের মধ্যে জামাতে আহমদীয়াকে আমি সংঘর্ষের জন্য শক্তিসম্পন্ন দেখছি। এই সংঘর্ষের পর সাব্যস্ত হবে ভবিষ্যত সভ্যতার ভিত্তি (Base) কে রাখবে? ইসলাম না ক্রিশ্চিয়ানিটি?! অতঃপর একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করেন: তিনি বলেন ঃ - আমরা ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা ভালবাসি। আমরা জানি, কোন কোন সময় দৌড়ের প্রাক্কালে যে ঘোড়াকে সবচে' পিছনে দেখা যায় পরবর্তীতে সেই ঘোড়াই সবাকে পিছনে ফেলে আগে এগিয়ে যায় আর বিজয়ী হয়। সুতরাং এ ধারণা করো না যে, আহমদীরা এখন দুর্বল, আমি তাদের ভিতর সেই শক্তি দেখছি যা christianity-র সাথে সংঘর্ষে যে কোন সময় বিজয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে"।

সুতরাং ইসলাম কেবল খৃষ্ট ধর্মই নয় বরং পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হবে একদিন। নিশ্চয় এই আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তে নূতন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে, ইনশাল্লাহ্।

– আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম

ওয়াক্‌ফে নও মোজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

১। হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান ওয়াকফে নও নং ২১৯৩এ
জন্ম ঃ ২২-০৭-৮৯ইং

২। কাউছার -ই- রহমান ওয়াকফে নও নং ৫৭৩ সি
জন্ম ঃ ১৭-০৫-৯১ইং
পিতা- এ্যাডভোকেট জহুরুল হক আনসারী, পটিয়া, চট্টগ্রাম

১। সালেহ আহমদ দেওয়ান ওয়াকফে নও নং ৭২৮৫এ
২। শোয়াইব আহমদ দেওয়ান ওয়াকফে নও নং " "
পিতা ঃ সৈয়দ আহমদ দেওয়ান
দাদা ঃ ইসমাইল দেওয়ান (আহমদ নগর)
নানা ঃ মরহুম আবু মূসা (কটিয়াদী)

স্মৃতি থেকে

আহমদীয়ত গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিরোধিতার ঝড় উঠলো। আমার বড় ভাই (চাচাত) উদ্যোগী হয়ে আমার সাথে বুঝা-পড়া করার জন্য একজন মৌলভী আনলেন। নাম তালেব হোসেন। এই মৌলভীর পিতা ছিলেন আমাদের বাড়ীর পীর। এঁদের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার চন্দন নগরে। এঁরা চন্দন নগরের পীর বলে খ্যাত। মাসে-চাঁদে আমাদের বাড়ীতে তাদের আনা-গোনা ছিল। এখন জীবন নগরের দৌলতগঞ্জ গ্রামে বসবাস করেন। আমার সাথে এই মৌলভী সাহেবের বেশ বন্ধুত্বও ছিল। আমাদের পাশের বাড়ীতে তিনি উঠেছেন। সেখানে আমাকে ডাকা হলো। আমি কয়েক দিন পূর্বে বয়াত করেছি। বয়াতের পূর্বে আহমদী জামাতের কোন বই পুস্তকও পড়ি নি। বয়াত করার পর মাত্র একখানি বই পেয়েছি। যার নাম হাদীসুল মাহ্দী। আল্লামা জিল্লুর রহমানের লেখা। কেবল মাত্র পড়া শুরু করেছি। আহমদীয়তের কোন বিদ্যাই তখন আমার ঘটে পড়ে নি। মাহ্দীর সত্যতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হ'লাম পাশের বাড়ীতে। দেখি মেয়ে-মর্দে প্রায় শতেক খানি লোক। সবাই মজা দেখতে এসেছে। আমি 'আস্সালামু আলায়কুম' বলতেই মৌলভী আমাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নাকি কাদিয়ানী হয়ে গেছ? ওপথ ছেড়ে দাও। তোমাকেও আমি একজন জ্ঞানী ধর্ম-ভীরু বলেই জানি। তাছাড়া তুমি একজন ভাল মানুষ বলে সবাই জানে। গ্রামের সবারই তুমি স্নেহধন্য। এমন হলো যে, তুমি কাদিয়ানী হতে গেলে ! তুমি এ গ্রামের মসজিদের ইমামতি করতে। সকলে তোমাকে ধার্মিক বলে জানে। কাজেই আমার অনুরোধ তুমি কাদিয়ানী ছেড়ে দাও।" উত্তরে আমি বল্লাম, "আমি কাদিয়ানী ছেড়ে দিতে পারি যদি আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসার উত্তর আপনি দেন?" মৌলভী সাহেব বললেন, "কী তোমার জিজ্ঞাসা?" আমি বললাম, আমার প্রথম জিজ্ঞাসা, "ঈসা (আঃ) যে চৌথা আসমানে জীবিত অবস্থায় আছে তা কুরআন থেকে দেখাতে হবে"। তিনি খুব তাচ্ছিলের সুরে আমাকে বললেন, "তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় চৌথা আসমানে রাখতে পারেন না"? আমি বললাম, "আল্লাহ্ পারেন না পারেন নয়, এ প্রশ্ন তো আমি করি নি। আমি জানতে চাচ্ছি, কুরআন শরীফের কোথায় তাঁর চৌথা আসমানে জীবিত অবস্থায় থাকার কথা আছে তা আপনি দেখান। তার পকেট থেকে একটি ছোট কুরআন শরীফ বের করলেন এবং আল ইমরানের ৬নং রুকূ বের করে পাঠ করতে লাগলেন। **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্ফিকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়া ওয়া মুতাহ্হেরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারূ।'**

তিনি বললেন, এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি বললাম, দেখুন! আপনি নিজেই বলেছেন, আপনি এ গ্রামের মসজিদে ইমামতি করেছি। তাহলে আপনার জানা উচিত, নিশ্চয় আমি কুরআন শরীফ পড়তে পারি। আর আরবীর পুরা না জ্ঞান থাকলেও কিছু অর্থ জানি। আমরা জানি চার এর আরবী 'আরবা' এবং আকাশের আরবী 'সামায়া।" আপনি যে আয়াত পাঠ করলেন এই আয়াতে অন্ততঃ এ শব্দ দু'টি আমাকে দেখান। বরং এই আয়াতে 'মুতাওওয়াফফিকা' শব্দের অর্থ মৃত্যু এবং 'রাফিউকা' শব্দের অর্থ উন্নীত করা। অর্থাৎ এখানে এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথাই বলা হয়েছে। এখানে আপনি ঈসা (আঃ) জীবিত অবস্থায় চৌথা আসমানে তুলে নেওয়ার কথা কোথায় পেলেন? এই আয়াতের পূর্ণ অর্থ হলো ঃ হে ঈসা ! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে উন্নীত করবো।"

আবোল তাবোল অর্থ করে আমাকে বুঝাতে পারবেন না। কুরআন শরীফের বহু আয়াত আমি খুঁজে পেয়েছি যাতে ঈসার মৃত্যুরই প্রমাণ হয়, কোথাও জীবিত থাকার ক্ষীণতম আভাসও মেলে না। এমন কি হাদীস থেকেও আপনি প্রমাণ করতে পারবে না যে, ঈসা (আঃ) চৌথা আসমানে জীবিত অবস্থায় আছে। বুখারীর হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মি'রাজে যান তখন তিনি মৃত ব্যক্তি ইয়াহহীয়া (আঃ)-এর সাথে অবস্থানরত দ্বিতীয় আস্মানে ঈসা (আঃ)-কে দেখেছেন।

উপস্থিত লোকজন প্রমাদ গুণতে লাগলেন, যিনি বুঝাবার জন্য আসলেন তিনিই এখন গফুর সাহেবের ছাত্র বনে যাচ্ছেন। অর্থাৎ মৌলভী সাহেবকেই বুঝিয়ে ছাড়লেন। মৌলভী সাহেব রণে ভঙ্গ দেয়ার অজুহাত খুঁজতে লাগলেন সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই যান এখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। আমি অন্য সময় তাঁর সাথে বসবো। এখন আমি গোসল করবো। ক্ষুধা পেয়েছে বলে তিনি গোসল করার জন্য কূয়ার দিকে যেতে লাগলেন। আমি তাকে বল্লাম, আমিতো আপনাকে বন্ধু বলেই জানি। অনুরোধ করছি, আহমদী জামাতের বই-পুস্তক পড়েন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, বই দিবেন পড়বো। পরবর্তীকালে তাকে বই দিয়েছি। পড়াশুনাও করেছেন। কিন্তু উপায়-অর্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে জামাতে শামিল হ'তে পারেন নি।

ক্রমে ক্রমে আমার আহমদীয়ত গ্রহণের কথা আশ পাশ গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। অত্র এলাকার জনগণ আমাকে একটি ভাল ছেলে বলে মনে করতো। কারণ তখন আমি গ্রামের সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে জড়িত ছিলাম, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, রাস্তাঘাট তৈরি করা। এমনকি গ্রামের জন-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে মেটে পায়খানা তৈরি করা, ধর্মীয় সভা-সমিতির আয়োজন করা। গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। খেলা-ধূলাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা। গ্রামে আমার নেতৃত্বে একটি যুব সংগঠন ছিল, যার নাম ছিল মিতালী সংঘ। এ সব কাজের জন্য তখন আমাকে এলাকার মানুষ খুব ভালবাসতো এবং সুনাম করতো। এ ধরনের একটি ছেলে ধর্মচ্যুত হয়ে কাদিয়ানী হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন সময় পাশের গ্রামের আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রায় আমার বাড়ীতে এসে হাজির হতো এবং আমাকে আহমদীয়ত ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতো। কিন্তু আলোচনা কালে সবাই আমার জিজ্ঞাসায় লা জবাব হয়ে ক্ষুণ মনে ফিরে যেত। তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট থেকে এমনভাবে পেত যে, সবাই হতবাক হয়ে যেত।

একদিনের ঘটনা, আমাদের পাশের খয়ের লুদা গ্রামের আবুল কাশেম নামে এক হোমিও প্যাথ ডাক্তার ছিলেন, আমাকে খুব ভাল বাসতেন। আমাদের বাড়ীতে আসলেন। সাথে আরও কয়েকজন। আমার বৈঠকখানায় বসলেন। তাদের আগমনে আমার বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনও উপস্থিত হলো। বিভিন্ন রকম প্রশ্নোত্তর শুরু হলো। আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলাম। তিনি যখন প্রশ্ন করেন তখন উপস্থিত সকলেই মনে করেন যে, এইবার আর উত্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আল্লাহ্ আমাকে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে যোগাতে লাগলেন যে, উপস্থিত সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতে লাগলেন। শেষে তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন, দেখুন আপনি একজন কলেজে পড়ুয়া ছাত্র মাত্র। কোন মক্তব মাদ্রাসায় আপনি পড়েন

নি। আলেম লাইনে আপনার জানাশুনা নেই। তাছাড়া দেশের বড় বড় আলেম-উলামা, পীর, মাশায়েখ থাকতে তাঁরা কেউ ইমাম মাহ্‌দীকে চিনতে বা বুঝতে পারলেন না। আর আপনি বুঝে ফেললেন? আমার মেঝ ভাই বললেন, 'দেখুন ডাক্তার সাহেব! এ প্রশ্নের উত্তরও তার কাছে আছে।' আমি বললাম, দেখুন ডাক্তার সাহেব, এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে। আপনারা আবূ জাহলের নাম শুনেছেন। নিশ্চয়। তার পূর্ব নাম কি ছিল তা কী জানেন? তার পূর্ব নাম ছিল ওমর ইবনে হিশাম ও আবুল হাকাম। অর্থাৎ জ্ঞানির পিতা। আরব দেশে মহা জ্ঞানী হিসাবে তার নাম মশহুর ছিল। এহেন পড়া-লেখা জানা মহা আলেম ব্যক্তি অক্ষর-জ্ঞানহীন হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে বুঝতে পারল না। এই মহা জ্ঞানী ব্যক্তিটির এত জ্ঞান কোন কাজে আসলো না কেবল মাত্র জ্ঞানের অহংকারের জন্য। তাই সে শেষমেশ অজ্ঞানীর পিতা হলেন। অথচ বিলাল অশিক্ষিত কৃতদাস হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে গ্রহণ করে হযরত বিলাল (রাঃ) হলেন। আমাদের দেশের মদ্রাসায় পড়া গর্বিত আলেমরা ইমাম মাহ্‌দী (সঃ)-কে বিদ্যার গর্বে বুঝতে চেষ্টা করছে না। কিতাবে আছে, "ইমাম মাহ্‌দীর সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে ঐ যুগের নামধারী আলেম-উলামারা তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দেবে।" ডাক্তার সাহেব নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, আমার মেঝ ভাই বলে উঠলেন, "কি ডাক্তার সাহেব উত্তর পেয়েছেন?' ডাক্তার সাহেব আমাকে ফেরাতে না পেরে আফসোস করতে করতে চলে গেলেন। এমনভাবে বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে আহমদীয়ত ত্যাগ করার প্রচেষ্টা চললো। যখন কেউ আমার সাথে আলোচনায় পেরে উঠলো না তখন অন্য পথ ধরলো। আমি তখন কুষ্টিয়া কলেজের আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। হোস্টেলে থেকে পড়া-শুনা করি। গরমের ছুটিতে বাড়ী আসলাম। গ্রামে প্রবেশ করে মনে হলো সবাই যেন আমাকে এড়িয়ে চলছে। রাস্তায় যেসব মানুষের সাথে দেখা হলো তারা ঠিকমত আলাপ করলো না। বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে দেখা মাত্র সরে দাঁড়াল কথা বলার ভয়ে। রাত্রে খাওয়ার সময় সাধারণতঃ আমরা পরিবারের সকলে রাখাল কৃষাণ সহ একই সাথে খাই। খাওয়ার সময় মা-ই কথা তুললেন, 'সারা গ্রামের লোক আমাদের এক ঘরে করেছে। কেউ জন-মুনিষ দেবে না। চাষ আবাদ সব নষ্ট হতে চলেছে। তুমি কাদিয়ানী ছেড়ে দাও।' আমার কাদিয়ানী ছেড়ে দিতে বলায়, আমার আব্বা মাকে ধমকিয়ে বললেন, "তুমি কি জান? জন-মুনিষ না দেয় আমরা নিজেরাই খেত সামলাব। আমাদের বাড়ীতে যে কৃষাণ ছিল সে আব্বাকে নানা বলে ডাকতো। নাম পটল। আমার আব্বা পটলকে বললো, 'কি পটল আমরা পারবো না?' পটল বললো, "হ্যা, নানা পারবো না কেন?" আমি বুঝতে পারলাম। আমাদের ক্ষেতে জন-মুনিষ দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন। তখন আমাদের এক মাত্র উপার্জনের ব্যবস্থা ক্ষেত-খামার। আর ঐ সময় কেবল মাত্র আউশ ধানের চাষ হতো। আব্বা একমাত্র উপার্জনক্ষম। আমি কলেজে পড়ি। ছোট ভাই ফোর ফাইভের ছাত্র। ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল নিয়ে প্রায় ৩০/৪০ বিঘার আবাদ। আব্বা যদিও মুখে বললেন, আমরা নিজেরাই ক্ষেত সামলাব কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এটা প্রবোধ বাক্য। বুঝতে পারলাম পরীক্ষা শুরু হলো। মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌ এ পরীক্ষা শুধু আমার নয়, এ তোমার মাহ্‌দীরও সত্যতার পরীক্ষা। মাহ্‌দী যদি সত্যি হয় তবে এ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হবই। আমারও সাধনা শুরু হলো ঐদিন এশার নামায থেকে। তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত শুরু করলাম। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে রোনাজারীর সাথে দোয়া করতে থাকলাম। সকালে নিজে মাঠে আঁচড়া দিতে গেলাম। কৃষাণের সাথে কাজ করতে দেখে আমার বড় চাচা দুঃখ করতে লাগলো। আমার গ্রামে আর একটি ছেলেও ইতোমধ্যে বয়াত করেছে তার নাম আবুল হোসেন। তবে অনেকেই তা জানে না। তার পিতা ও আমার চাচা বলাবলি করতে লাগলো। মানুষ খারাপ কাজ করলে, লুচ্চামি করলে, নেশা করলে তাদের বেলায় কোন শাসন নেই। আর যে ছেলেটি এ গ্রামের মধ্যে সবচে' ভাল, লেখা পড়া জানে, নামায রোযা করে, পরের উপকার করে, গ্রামের সকল প্রকার উন্নয়নের কাজ করে তাকে কিনা করেছে বয়কট। হায় কলিকাল!সারা দিন মাঠে মাঠে আড্ডা দিয়ে বেড়িয়ে চরম ক্লান্তি। দুপুরে খেতে দেওয়ার সময় মা আমার অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন। মাকে বললাম, আমি যদি সঠিক ধর্মের পথে থাকি তবে আল্লাহ্‌ নিশ্চয় আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। ঐ দিন রাত্রেও খাওয়ার সময় সবাইকে বললাম, 'ইমাম মাহ্‌দী যদি সত্যি হয় আর আমি যদি সঠিক পথে থাকি তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।" ক্ষেতে নিড়ানী দেয়া খুবই প্রয়োজন। এ সময় নিড়ানী দিতে না পারলে ধান হওয়া সম্ভব নয়। ৩০ বিঘা জমির ধান দু' একজনে নিড়ানী দেয়া কখনই সম্ভব নয়। সময় প্রতিদিন ছয় সাত জন করে কামলা থাকে ধান পাট নিড়ানীর জন্য। অথচ একজন কামলাও নেই। রাত্রে ইশার নামাযে ও তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করতে থাকলাম। পরের দিন বিকালে মাঠের ধান পাট দেখতে গেলাম। নিড়ানীর উপযুক্ত সময় বয়ে যাচ্ছে। মাঠে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হলো, এই সময় আলম ডাঙ্গা, হালসার দিক থেকে কামলা খাটার জন্য লোকজন আসে। একেক দলে ১০/১৫ জন আসে ২০/৩০ দিন কামলা খাটে বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে। মনে করলাম, এমন ধরনের একটা দল নিয়ে আসবো। দুই একদিনের মধ্যে নিড়ানী নিয়ে ছেড়ে দেব। প্রায় প্রতিদিনই এসব লোক উথলি রেল ষ্টেশনে নামে। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যে বড় রাস্তা জীবননগর অভিমুখে গেছে ঐ রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের গ্রামের উত্তর পূর্ব দিকে শিয়ালমারী গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে হিন্দু সিডিউল কাষ্ট শ্রেণীর বাস। যাদের দ্বারা আমি ক্ষেতে কাজ-কাম করি। আমার গ্রাম থেকে তাদেরকে আমার ক্ষেতে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ গ্রামের উপর দিয়ে ঐ রাস্তা গেছে। ঐ গ্রামের রাস্তার পার্শে একটি বৃহৎ অশ্বথ গাছ। ঐ গাছের গোড়ায় অপেক্ষা করতে লাগলাম কামলার লোকজন পাওয়ার আশায়। ঐ গ্রামের লোকদের আমরা সর্দার বলি। ঐ সর্দারদের একজন মোড়ল, নাম রিশে সর্দার, আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধীর পদক্ষেপে আমার নিকট আসলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "মিয়াঁ, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" উত্তরে বললাম, "তোমরা তো আর আমায় জন দেবে না, তাই উত্তরে জন পাওয়ায় ভরসায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।" কামলাকে আমরা জন বলি। রিশে বললো, তাইতো মিয়াঁ আপনাদের গ্রামের ইয়াকুব মন্ডল আমাদের আপনার ক্ষেতে জন দিতে মানা করেছে। আপনি নাকি কাদিয়ানী হয়ে গেছেন। আমি বললাম, দেখ তোমরা হিন্দু আমরা মুসলমান, আমি যদি অন্য কিছু হয়ে যাই তাতে তোমাদের ধর্মের তো কোন ক্ষতি করছি না। রিশে বললো, তাতো ঠিক মিয়াঁ। আমাদের তো আর নষ্ট করছেন না। তবে আমাদের আপনার ক্ষেতে কাজ করতে আপত্তি কেন? আমরা সারা জীবন আপনার ক্ষেতে জন খেটে আসছি। আমরা কাজ না করলে আপনার ক্ষেতই বা উঠবে কেমন করে। আর

আমাদেরই বা খাটাবে কে? আপনি এখানে দাঁড়ান মিয়াঁ। আমি পাড়ার ভিতর থেকে ঘুরে আসি। আমি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দোয়া করতে থাকলাম। প্রায় আধ ঘন্টা পর রিশে ফিরে আসলো আরও দু'জনকে সাথে নিয়ে। ওরা বললো, "আমরা কাল আপনার ক্ষেতে জন যাব। আমরা যত জন আছি কাল কেবল মাত্র আপনার ক্ষেতেই যাব। অন্য কারও ক্ষেতে যাব না। একদিনেই আপনার ক্ষেত সব নিড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবো। প্রথম কোন জমিতে বসবো বলে দিন। সকালে আমাদের জন্য তামাক নিয়ে আসবেন। আমি তাদেরকে গ্রামের নিকট একটি ক্ষেতে বসার কথা বলে চলে আসলাম। মাগরেবের নামাযে খুব দোয়া করলাম। নামাযের পর তামাক কুটলাম। গুড় দিয়ে মাখালাম। মা বললেন, জন নেই মুনিষ নেই তামাক দিয়ে কী হবে?" কোন উত্তর দিলাম না। রাত্রে খাওয়ার পর ইশার নামায পড়ছি। কানে আসলো ছোট ভাই-এর ডাক, আব্বার ঘরে যাওয়ার জন্য বলছে। নামাযান্তে আব্বার ঘরে গিয়ে দেখি ইউসুফ নামে এক ব্যক্তি আব্বার সাথে কথা বলছে। আমাকে দেখে বললো, "মামা কাল ৭/৮টা জন হবে। কোথায় নিড়াতে হবে বলেন?" তার কথা শুনে আমার রাগ হলো, "বললাম তুমি কি আমার বাড়ীতে অপমান করতে এসেছ?" সে বললো, না মামা, আমরা এই বয়কোট মানি না। আপনি আমাদের কী ক্ষতি করেছেন যে, আপনাকে জন দেয়া হবে না। মুহাম্মদ মন্ডল আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আর তিনি বলছেন, আপনার মত ভাল মানুষকে যদি বয়কোট করা হয় তাহলে আমরা তা মানতে রাজি নই। তিনি বলেছেন, তোরা কাল তার ক্ষেতে নিড়াতে যাবি। তারপর যা হয় আমি দেখবো। মুহাম্মদ মন্ডলের কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো। কারণ মড়লদের মধ্যে ঐ লোকটি নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনার অধিকারী। আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী ক্ষেতে তাদের বসার কথা বলে দিলাম। রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে খুব দোয়া করলাম। আল্লাহ্, তুমি তোমার মাহ্দীর সত্যতার নিদর্শন দেখাও। হিন্দু সর্দার জনরা খেতে আসে সকালে আর ছুটি করে বেলা ৪টার দিকে। আর গ্রামের মুসলমান জনরা আসে ৯/১০টায়, ছুটি করে সন্ধ্যায়। ফজরের নামায পড়ে খুব দোয়া করে একটু বেলা হলে যে ক্ষেতে সরদার জনদের নিড়ানীর জন্য বসার কথা ছিল সেদিকে রওনা দিলাম। নিজ হাতে করে তামাক নেয়ার সাহস পেলাম না। যদি সরদাররা না আসে তবে তামাক হাতে ফিরে আসবো কি করে। যাবার সময় মা কে বলে গেলাম, যদি কেউ তামাক নিতে আসে দিয়ে দিও। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ক্ষেতের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বুকে দুরু দুরু ভাব। না জানি কি হয়। ক্ষেতটি ছিল নিচু জায়গায়। তাই দূর থেকে কোন লোকজন দেখা যাচ্ছিল না। নিকটে যেতেই দেখি তিন বিঘা জমির লম্বা-লম্বি এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত এক সারিতে ৩০ জন নিড়াতে শুরু করেছে। আমাকে দেখে সবাই বললো, তামাক কৈ? অপেক্ষাকৃত বয়সে ছোট একজনকে বললাম, যা বাড়ী যা, তামাক রেডি আছে। মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবি। আর মাকে বলবি ৩০ জনের জন্য বেশি করে চাল ডাল ভিজাতে।" তারা পণ করলো, আজকের মধ্যেই সকল জমির নিড়ানী শেষ করতে হবে। কারণ গ্রামের সকলে জানার আগেই কাজ সেরে ফেলতে হবে। পরে আবার বাধা দিতে পারে। বেলা দশটা পর্যন্ত জনদের সাথে থেকে বাড়ী চলে আসলাম। সময় হলে তাদের একজনকে পাঠিয়ে বাড়ী থেকে জল খাবার নিয়ে যেতে বললাম।

দশটায় বাড়ী এসে নাস্তা করে বাড়ীর পাশের জমিতে গেলাম, দেখলাম ৮ জন নিড়াতে বসে গেছে। সারা দিনই প্রায় তাদের সাথে তবলীগী আলোচনা হলো, এদিকে ৪টার সময় সর্দার জনেরা এসে টাকা নিয়ে গেল আর বলে গেল যে, ধান ও পাটের অধিকাংশ জমি নিড়ান হয়ে গেছে। গ্রামের পাশের জমিটিও নিড়ান হয়ে গেল সন্ধ্যা নাগাদ। ঐ জমির পাশের জমিতে আমার সেই বিরোধী বড় ভাই নিড়ানী দিচ্ছিলেন। বাড়ী আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, সব জমি নিড়ান হয়ে গেল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এমন সুন্দর 'যো' সব সময় পাওয়া যা না, ভাল যো-ই তোমার ক্ষেত নিড়ানী হয়ে গেল। আমি বললাম, এ সবই আল্লাহ্র কৃপা। এমনিভাবে একদিনে আমার সকল জমির নিড়ানী করে দিয়ে আল্লাহ্ তার মাহ্দীর সত্যতার প্রমাণ দিলেন। রাত্রে খাওয়ার সময় আমাদের কৃষাণ পটল বলতে লাগতো, 'নানা, গ্রামের লোক আমাদের মামা কাদিয়ানী হয়ে গিয়েছে বলে জন দিচ্ছিল না। অথচ মামা বাড়ী এসে একদিনে সব ফসলের জমিই নিড়ানী দিয়ে ফেললো, একদিনে ৩৮টা জন! এ যে তেলেসমতী ব্যাপার মামাই তো সঠিক পথের পথিক! মামার সাথেই আল্লাহ্ আছেন। না হলে সারা এলাকার লোক আমাদের জন-মুনিষ দেবে না বলে জোট পাঁকিয়েছে আর তিনি এসে এত জন যোগাড় করে ফেললেন? আর ভয় নেই। আমি বললাম, এ ইমাম মাহ্দীর সত্যতার নিদর্শন। আমার আব্বা আনন্দের হাসি হাসতে লাগলেন।

- মোহাম্মদ আব্দুল গফুর

সন্তান লাভ

আমার কনিষ্ঠ পুত্র লন্ডন নিবাসী সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমদ জুবায়ের ও তার বিবি গাজালা ইয়াসমিন জুবায়েরকে গত ১১-০৫-২০০১ দিবাগত রাত্রে আল্লাহ্তাআলা এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। জন্মের পূর্বে পিতা মাতার দরখাস্ত অনুযায়ী কন্যাকে ওয়াককে-নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে তাদের এক পুত্র সন্তানকেও ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবজাতক এবং তার মাতা সুস্থ আছেন। এই শিশুকে যেন আল্লাহ্তাআলা সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন এবং মেয়েটি যেন ভবিষ্যতে মুত্তাকী, মেধাবী ও ইসলামের মুখলেস খাদেমা হয় তজ্জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

নবজাতক শিশুটি কুলিয়ারচরস্থ মরহুম সৈয়দ নুরুল আলম সাহেবের দৌহিত্রী।

সৈয়দা মোমেনা বেগম
তাতারকান্দি, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ

শোক সংবাদ

গাজিপুর জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হাজী মৌলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের বড় ছেলে জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব (৫৫) বছর বয়সে গত ২৯-৪-২০০১ইং ভোর ৩.৫৫ মিনিটে নিজ বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে...রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, দুই কন্যা, বৃদ্ধা মাতা, পাঁচ ভাই, তিন বোন, সহ বহু আত্মীয়বর্গ রেখে যান।

মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্ পাক যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন সে জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্পাক যেন মরহুমের পরিবারবর্গকে এই শোক কাটিয়ে উঠার জন্য 'সাবরে জামীল' দান করেন।

মাহমুদ আহমদ আনসারী
মোয়াল্লেম

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 21st Issue

May 15, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

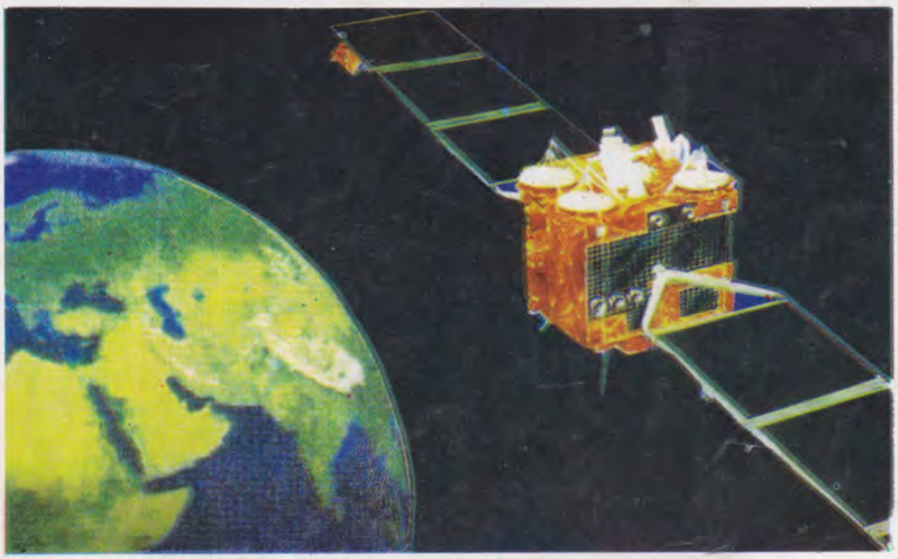

لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ MTA-এর দর্শকদের জন্য সুখবর!

এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন প্রযুক্তি আর উৎকর্ষের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এশিয়ার দর্শকদের জন্য গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ থেকে এম টি এ ডিজিটাল সম্প্রচার আরম্ভ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)। এর পাশাপাশি এনালগ সম্প্রচার আগের মতই আগামী কয়েকমাস চালু থাকবে। তাই দর্শকদের কাছে ডিজিটাল সিস্টেমে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। DIGITAL সম্প্রচার ধারণ করতে আপনার কেবল একটি নতুন DIGITAL RECIEVER SET লাগবে। DISH আর LNB অপরিবর্তীত থাকবে। নতুন RECIEVER-এর মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা পড়বে।

আকাশে এমটিএ-এর নতুন ঠিকানা ঃ

MTA INTERNATIONAL (DIGITAL)
SATTELLITE : ASIASAT 2
POSITION : 100.5^0 EAST
SYMBOL RATE : 27500
DOWN LINK FREQ : 3660 MHZ
POLARITY : VERTICAL
PID : AUTO & OTHER NOS.
FEC : 3/4

ডিজিটালে দশ ফিট ডিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছবি ও শব্দ ধারণ করা যায়। একই FREQUENCY -তে সউদী টিভি চ্যানেল 'ওয়ান' ধরা হয়। সমস্ত কেবল টিভি ব্যবসায়ীরা এই স্যাটেলাইট ধরে থাকেন।

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রতিটি ঘরে এমটিএ-এর সংযোগ নিন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান মালা দেখুন। পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯ ফ্যাক্স ঃ ৭৩০০৯২৫
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 7300925